পত্র - ৪১২

শিরোনাম : তুলনামূলক সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মেঘদূত (পূর্বমেঘ : কালিদাস) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১. কালিদাস-প্রতিভা : কবি ও কাব্য

একক ২. মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস

একক ৩. মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা

একক ৪. নিসর্গচেতনা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ মেঘদূত (উত্তরমেঘ) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৫. বিরহভাবনা

একক ৬. কাব্যের চরিত্র

একক ৭. ছন্দ-উপমা

একক ৮. পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৪ র্থ অঙ্ক) (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ৯. কবি-নাট্যকার কালিদাস

একক ১০. নাটকের কুশীলব (চরিত্র)

একক ১১. নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

একক ১২. চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স (সময় : ৪ ঘণ্টা)

একক ১৩. অধ্যায়ের আলোচনা (প্রথম ন'টি)

একক ১৪. অনুকরণ তত্ত্ব

একক ১৫. কমেডি

একক ১৬. ট্রাজেডি

সূচিপত্র

পত্র - ৪১২

ষষ্ঠ পত্র	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১ ১ মেঘদূত (পূর্বমেঘ : কালিদাস	১.	কালিদাস-প্রতিভা : কবি ও কাব্য	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	১-৬
	২.	মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৬-৭
	৩.	মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৭-১০
	৪.	নিসর্গচেতনা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	১০-৩০
পর্যায় গ্রন্থ : ২ মেঘদূত (উত্তরমেঘ)	৫.	বিরহভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩১-৩৪
	৬.	কাব্যের চরিত্র	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩৪-৩৫
	৭.	ছন্দ-উপমা	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩৫-৩৮
	৮.	পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৩৮-৫২
পর্যায় গ্রন্থ : ৩ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্	৯	কবি-নাট্যকার কালিদাস	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৫৩-৫৮
	১০	নাটকের কুশীলব (চরিত্র)	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৫৮-৬০
	১১	নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৬০-৬৪
	১২	চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব	অধ্যাপক ডক্টর কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	৬৪-৯৫
পর্যায় গ্রন্থ : ৪ অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স	১৩	অধ্যায়ের আলোচনা (প্রথম ন'টি)	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	৯৬-১০১
	১৪.	অনুকরণ তত্ত্ব	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০১-১০৩
	১৫.	কমেডি	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০৩-১০৬
	১৬.	ট্রাজেডি	ড.হীরেন চট্টোপাধ্যায়	১০৬-১২৫

পত্র - ৪১২

পর্যায় গ্রন্থ : ১ মেঘদূত (পূর্বমেঘ : কালিদাস)

একক ১. কালিদাস-প্রতিভা : কবি ও কাব্য

বিন্যাস ক্রম ঃ

৬.১.১.১ ঃ বিষয়সূচী (পূর্বমেঘ)

৬.১.১.২ ঃ কালিদাস প্রতিভা ঃ কবি ও কাব্য

৬.১.১.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১.১.১ ঃ বিষয়সূচী (পূর্বমেঘ)

বিষয়	শ্লোক	বিষয়	শ্লোক
বিরহী যক্ষ		শিপ্রা	৩২
ও রামগিরি	১-৫,১২	ললিতবনিতা	৩৩
মেঘ	৬-৯,১৫	গন্ধবতী	৩৪
অলকা পরিচয়	৭	মহাকাল	৩৫-৩৭
পথিকবনিতা	৮	অভিসারিকা	৩৮
যক্ষবধূ	১০	ভবনবলভি	৩৯
মেঘসহচর রাজহংস	১১	কমলবন	৪০
শুভযাত্রা	১৩	**পুনর্যাত্রা**	
সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা	১৪-২২	গম্ভীরা (নদী)	৪১-৪২
ইন্দ্রধনু	১৫	দেবগিরি	৪৩-৪৫
জনপদবধূ	১৬	চর্মণ্বতী (নদী)	৪৬-৪৭
আম্রকূট	১৭-১৮	দশপুর	৪৮
রেবা	১৯-২০	**ব্রহ্মাবর্ত** (জনপদ)	
সারঙ্গ	২১	কুরুক্ষেত্র	৪৯
ময়ূর	২৩	সরস্বতী	৫০
দশার্ণ জনপদ	২৪	**কনখল থেকে আলকা**	
বেত্রবতী নদী	২৫	গঙ্গা	৫১-৫২
নীচৈঃ গিরি	২৬-২৭	হিমালয়	৫৩-৫৭
উজ্জয়িনী-পথে		ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম বা	
উজ্জয়িনীর সূচনা	২৮	হংসদ্বার বা ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র	৫৮

নির্বিন্ধ্যা	২৯	কৈলাস	৫৯-৬৩
সিন্ধু	৩০	অলকা	৬৪
শ্রীবিশালা (বিশালা) বা উজ্জয়িনী	৩১		

৬.১.১.২ ঃ কালিদাস-প্রতিভা ঃ কবি ও কাব্য

অনন্ত রত্নপ্রভব প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা নেই। কত রাজা-মহারাজা, রাজ্য-রাজধানী, প্রাকৃতিক, দার্শনিক, অধ্যাত্ম ও সারস্বত ঐশ্বর্যে পূর্ণ তার অন্তর। শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণবন্ত নিদর্শনে ঋদ্ধ তার হৃদয়। সেই হৃদয়কে, তার আত্মাকে যিনি দিব্য ও অনন্ত সত্যে প্রসারিত করেছিলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাসক মহাকবি কালিদাস। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে তিনি বিশ্ববরেণ্য। আদি কবি বাল্মীকির পর সংস্কৃত সাহিত্যে এতবড় প্রতিভা তাঁর সমকালে কেবল ভারতে নয় সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশে আর জন্মায়নি। এই ধারার শেষ প্রতিভা, বোধকরি প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—শুদ্ধ সন্দর্ভ রচয়িতা—'কবিনৃপচক্রবর্তী', গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেব গোস্বামী।

প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণদীপ্ত এক সুমঙ্গল জীবনাদর্শের দ্রষ্টা-স্রষ্টা ও উপভোক্তা ছিলেন কালিদাস। সুনীতি-সুরুচিসমুজ্জ্বল এক সুনির্মল-প্রশান্ত জীবনবোধের ভাষ্যকারও ছিলেন তিনি। বস্তুত চিরায়ত কাব্যের (Classic Poetry) যা কিছু গুণৈশ্বর্য ও মহিমা তা তাঁর সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠক-পাঠিকার অন্তরে। তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বজনীন কবি—বিশ্বকবি (The Poet of the Universe)।

কোনো কোনো সমালোচক কালিদাসকে যুগন্ধর কবিরূপে সম্মান দান করলেও সাহিত্যে তাঁর যুগাতিশায়িতার দিকটি এড়িয়ে গেছেন। তাঁর মতো মহৎ ও বিরল প্রতিভাকে কোনো সংকীর্ণ সীমায় আটকে রাখা যায় না, রাখা চলেও না। এই জাতীয় একপেশে-সংকীর্ণ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সমঝদার সমালোচকদের কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্যের উল্লেখই যথেষ্ট। 'হরিহরাবলী'তে প্রাচীন কবির্মণীষীদের তালিকায় একমাত্র কালিদাসকেই প্রকৃত কবি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে—

"পুরা কবীনাং গণনা-প্রসঙ্গে
কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতঃ কালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্য কবেরভাবাৎ
অনামিকা সার্থবতী বভুব।।"

মহাকবি বাণভট্ট থেকে শুরু করে কবি জয়দেব, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবৃন্দ কালিদাস প্রশস্তিতে মুখর। জয়দেবের দৃষ্টিতে তিনি 'কবিকুলগুরু', মধুসূদনের কাছে তিনি 'পিককুলপতি' আর

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বোধে তিনি ছিলেন চিরকালের কবি—'কবিপতি'। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে ভারতাত্মার প্রতিনিধি—'ভারত পথিক' রূপে গ্রহণ করেছেন।

কেবল প্রাচ্যদেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা রূপে স্বীকৃতিধন্য হয়েছেন কালিদাস। প্রাচ্য বিদ্যার্ণব স্যার উইলিয়ম জোন্স-কর্তৃক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় আংশিক রূপান্তর (১৭৮৯) ও ১৮১৩ সালে হোরেস হে ম্যান উইলসন-কর্তৃক 'মেঘদূতম্'-এর ইংরেজী কাব্যানুবাদ মহাকবি কালিদাসকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলে। অতপর কালিদাসের সাহিত্যে সমুজ্জ্বল ভারতীয় রসলোকের সন্ধানে বিস্ময়বিমূঢ় অনেক বিদগ্ধ কবি-দার্শনিক-সমালোচক প্রাচ্য সাহিত্যের অমৃতরসলোকে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন, মুখর হয়েছেন কালিদাস প্রশস্তিতে। হ্যামবলডট্, গ্যায়টে, ডঃ রাইডার, ডঃ সিলভ্যাঁ লেভি, মনিয়ের উইলিয়মস্, ম্যাক্সমূলার, কীথ, উইনটার-নিৎসজ, অধ্যাপক ল্যাসেন প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রচনাবলী ঃ

কালিদাসের রচনাবলীরূপে চিহ্নিত ও সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা মূলত সাত। এদের মধ্যে কাব্য চারখানি এবং সেগুলি যথাক্রমে 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', ও 'রঘুবংশ' এবং নাটক তিনখানি যথাক্রমে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশীয়', ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'।

কালিদাসের কাল ঃ

কালিদাসের সাহিত্যরসমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন—

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"

সকল বিচার-বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল কবিকে নিয়ে নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের রসেই আকণ্ঠ তৃপ্ত থাকার বাসনা প্রকাশ করে উত্তমর্ণ কবির ঐশ্বর্য-গৌরবময় ভাবজগতের রহস্যঘেরা কল্পলোকে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন—

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।।"

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, একালের আধুনিক গীতিকবির নবরত্নের মালায় 'দশম রত্ন' হয়ে ফুটে ওঠার আকাঙ্ক্ষা কি নিতান্তই বায়বীয় আবেগপ্রসূত, নাকি এক বিশেষ কালের বিশেষ কবির মানস-বিকাশের পরিপ্রেক্ষা-আশ্রিত? রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি যাইহোক না কেন, মহাকবি কালিদাস কোন্ বিশেষ যুগের সৃষ্টি এবং কোন্ সাহিত্য অনুরাগী নরপতি ও রাজসভা তাঁর মতো অমূল্য রত্নকে ধারণ করে ধন্য হয়েছিল—এনিয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সুতরাং, কালিদাস ও তাঁর আবির্ভাব কাল, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহে পণ্ডিতকুল বিচিত্রমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের সেই সকল

পরস্পর বিরোধী মতবাদের সরল সমীকরণ প্রায় অসম্ভব। তাই পণ্ডিতবর্গের কূট-তর্কজালের নিবিড় অরণ্যে পথ না হারিয়ে কবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাস্য রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে।—

(১) পণ্ডিত হিপ্পোলিতে ফৌস (Hippolyte Fauche)—এঁর মতে কালিদাস খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কবি এবং রঘুবংশীয় নরপতি অগ্নিবর্ণের সমসাময়িক।

(২) ডঃ সি. কানহন্ (Dr. C. Kunhan), সারদারঞ্জন রায়, কুমুদরঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ কালিদাসকে শুঙ্গবংশীয় নরপতি অগ্নিমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতকের কবি বলে মনে করেন।

(৩) উইলিয়ম জোন্স, সি. এস. পাণ্ডে, বি. ডি. উপাধ্যায়, এম. আর. কালে, আর. এন. আপ্তে, আর. ডি. কর্মকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জি. এস. হীরাচাঁদ ওঝা, কে. পি. মিত্র, ডঃ রাজবলি পাণ্ডে প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী কালিদাসকে খ্রিঃপূঃ প্রথম শতকের কবি বলে মনে করেন। এঁরা সকলেই পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য সহযোগে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কালিদাস ছিলেন কিংবদন্তীখ্যাত উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ নরপতি বিক্রমাদিত্যের রাজসভাকবি। বিক্রমাদিত্য খ্রিঃপূঃ ৫৭ অব্দে শকদের পরাজিত করেন এবং স্বনামে 'বিক্রমসংবৎসর' চালু করেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাসসম্মত নয়।

(৪) অধ্যাপক ল্যাসেন ও ডঃ ওয়েবারের বিশ্বাস, কালিদাস খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক।

(৫) ডঃ এ. বি. কীথ মনে করেন, কালিদাস খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের কোনো সময়ে হূন-বিজেতা ইতিহাসখ্যাত উজ্জয়িনীর রাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্যে'র রাজত্বকালে (খ্রিঃ ৩৮০-৪১৩) আবির্ভূত হন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। এই দুই নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় কালিদাস-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। ডঃ ব্যুলার, স্মিথ, প্রিন্সেপ ম্যাকডোন্যাল, ডঃ ডি. সি. সরকার, উইনটারনিৎসজ্, স্টেনকনৌ, লাইবিস, টি. ব্লঁস, পণ্ডিত রামাবতার শর্মাচার্য প্রমুখ সাহিত্যাচার্যগণের অনেকেই এই মতের সমর্থক। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট এই মতই এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত।

(৬) ডঃ ফার্গুসন কালিদাসের জীবৎকালকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। ডঃ হোর্নলি, ভউ দাজী (Bhau Daji), কার্ন, ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর, ম্যাক্সমূলার, কে. বি. পাঠক প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল কালিদাসকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কবি বলে মনে করেন।

যাইহোক, কালিদসের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সাধারণভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত হল এই যে কালিদাস গুপ্তযুগের খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কবি এবং খুব সম্ভবত কিংবদন্তীর জনপ্রিয় মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (৩৮০-৪১৩ খ্রিঃ) ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়া ও হূণ বিজয়ের উল্লেখ, 'মালবিকাগ্নিমিত্রে',

পূর্বসূরী অথবা সমসাময়িক দার্শনিক মনীষী ধাবক, সৌমিল্লক, কবিপুত্র প্রভৃতির উল্লেখ, বৎসভট্টির দশপুর প্রত্নলেখে (৪৭৩ খ্রিঃ) কলিদাসীয় রচনাশৈলীর অনুসরণ ও কুমারগুপ্তের জন্মোৎসবের ভাবছায়ায় 'কুমারসম্ভব' রচনা, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রস্তরলিপিতে (Aihole Inscription) যশস্বী প্রাচীন কবিদের নামের সঙ্গে কালিদাসের নামোল্লেখ এবং বাণভট্টের হর্ষচরিতে (খ্রিঃ সপ্তম শতাব্দী) কালিদাস প্রবর্তিত বৈদর্ভী রীতির অনুসরণ প্রভৃতি থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে কালিদাস গুপ্তযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

গুপ্ত যুগ ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। জ্ঞানে-গরিমায়, ঐশ্বর্যে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসন-শৃঙ্খলায়, শৌর্যে-বীর্যে, সর্বোপরি দর্শন-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় প্রদীপ্ত গুপ্তযুগ—ভারতবর্ষের গৌরবময় স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট হিন্দু সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের পরিচয়ে ভাস্বর এই যুগ কালিদাসের রসচিকীর্ষার পথকে উজ্জীবিত ও প্রশস্ত করেছিল। একটা পরম ঐশ্বর্যময়, জীবনবাদী ও সম্পন্ন কালের পটভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তাঁর সাহিত্যে জীবনরসের নিবিড়তা আমাদের এমন করে টানে।

একক - ২

মেঘদূত কাব্যের ভাব উৎস

বিন্যাসক্রম

৬.১.২.১ মেঘদূত' কাব্যের ভাব উৎস

৬.১.২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৬.১.২.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৬.১.২.১ঃ মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস

কালিদাসপূর্ব যুগে 'মেঘদূত' একখানি অশ্রুতপূর্ব কাব্য এবং সে কাব্যের অভিধা 'দূতকাব্য'। প্রাচ্য মহাদেশের তো বটেই, সমগ্র বিশ্বের প্রথম অপূর্বসৃষ্ট দূতকাব্য মেঘদূত। এছাড়া আরও একদিক থেকে মেঘদূত বিরল সম্মানের অধিকারী, আর তা হল এই যে এই কাব্যটিই বিশ্বের প্রথম রোমান্স ও লিরিকধর্মে প্রজ্জ্বল গীতিকাব্য (Romantic-Lyric Poetry)।

বস্তুত 'মেঘদূত' দূতকাব্যরূপে অভিনব হলেও তা 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে ওঠেনি। কেননা তার একটা পূর্বৈতিহ্য আছে। বৈদিক সাহিত্যে প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানবধর্ম আরোপ করার রীতি প্রচলিত ছিল। এই সূত্রে "মেঘ ও বর্ষার নিবিড় রসঘন অনুষঙ্গ ঋষিকবিকে মুগ্ধ করেছিল। বায়ুবাহিত জলভারনত মেঘের বিদ্যুৎবিলাস, ভৈরবগর্জন, বর্ষণসিক্ত বসুন্ধরার বুকে জলাশয়ে প্রমত্ত দাদুরীর উল্লম্ফন ও ঐকতান-সঙ্গীত কবিদৃষ্টিতে যে রসাপ্লুত করেছিল তার পরিচয় পাই অথর্ববেদে।" তবে "নিসর্গ প্রকৃতি ও মানবেতর প্রাণীদের এমনিভাবে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করার মুহূর্ত বৈদিক সাহিত্যে সুলভ হলেও তাদের দিয়ে দৌত্যকার্য সাধনের পরিচয় সেখানে নেই।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', ২য় সং, কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

পুরো কাব্যরূপে না হলেও ভাবগত ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে মেঘদূতের বীজ রামায়ণে ও মহাভারতে পাওয়া যাবে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (সর্গ ২৮ /৭) ও সুন্দরকাণ্ডে (সর্গ ৩৩-৪০) বর্ষার অনুষঙ্গে সীতাবিরহে কাতর শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক সীতান্বেষণে হনুমানকে প্রেরণের ঘটনা এর দৃষ্টান্ত। রামায়ণের 'কপিদূত-সংবাদ'-এর পাশেই মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যানটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নল-প্রেমমুগ্ধ দময়ন্তী হংসদূতের মাধ্যমে তাঁর বিরহের বার্তা প্রেমিকপ্রবর নলের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

মহাকাব্যের এই দুটি আখ্যান কালিদাসের মেঘদূতের ভাবপ্রেরণারূপে কাজ করেছিল বলে মনে হয়। তবে মেঘদূত কাব্যের প্রখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ, পূর্ণসরস্বতী, বল্লভদেব, দক্ষিণাবর্তনাথ প্রমুখ মেঘদূতের ভাব-উৎসরূপে মহাভারতের নলোপাখ্যান নয়, রামায়ণের কপিদূত প্রসঙ্গই উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে মৎপ্রণীত 'মেঘদূত-জিজ্ঞাসা' (২য় সং) থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে—

"স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মহাকবি বাল্মীকি কপিদূতের মাধ্যমে সীতান্বেষণ ও রাবণ-কবলিত সীতা উদ্ধারের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। মেঘদূতের উৎসমূলে রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'হনুমৎসন্দেশ'-এর ভাবছায়া বর্তমান। বাল্মীকির সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যা ছিল ছায়াশরীর, কালিদাসের উদাত্ত-মহিমান্বিত কল্পনায় তা রঙে-রসে সমুজ্জ্বল মৃণ্ময় কায়াশরীর লাভ করেছে, জন্মলাভ করেছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব বিরহদীর্ণ রোমান্টিক প্রণয়গাথা মেঘদূত। পূর্বসূরির গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও বাল্মীকির ভাবনাকে একটু ভেঙেচুরে বৈচিত্র্য-বিস্তারে নিপুণভাবে সাজিয়ে নির্মাণ করেছেন মেঘদূত কাব্যের বাক্‌প্রতিমা। তাতে অনাবৃত হয়েছে নিসর্গ-প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যপ্রতিমা। এমনিভাবে চিরপুরাতন চিরনতুনের বাণীবহ হয়ে ওঠে শিল্পীর স্বতন্ত্র ব্যবহারিক প্রকরণে। ওই রসশাস্ত্রের কথাই প্রতিষ্ঠিত হল—'ব্যবহরয়তি সুকবি কাব্যেষু স্বতন্ত্রতয়া'। এমনি করেই একের ভাব অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে প্রতিভার প্রাণবত্তায় নবসৃষ্টিরূপে ভাস্বর হয়ে ওঠে। .... বাল্মীকির কপিদূত ভাবনার কালিদাসীয় মেঘদূত কল্পনায় উত্তরণ কবিপ্রতিভার মৌলিকতাই সূচিত করে।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', ২য় সং, পৃঃ ১৬—-কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

কাব্যে মানবেতর প্রাণীদের দিয়ে দূতের কাজ করালে তা 'অযুক্তিমদ্‌দোষ' হয় বলেছেন কালিদাস-পূর্ব আলঙ্কারিক ভামহ। কালিদাস শিল্পীর স্বাধীনতার উপর এরূপ বিধিনিষেধকে মানেননি, 'মেঘদূত' রচনা করে তাঁর প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন। চিরায়ত এই যুগজয়ী কাব্যের অনুকরণে 'কপিদূত', 'পিকদূত', 'হংসদূত', 'ইন্দুদূত', 'চন্দ্রদূত', 'পদাঙ্কদূত', 'পবনদূত' প্রভৃতি অসংখ্য দূতকাব্য রচিত হয়েছে।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মেঘদূত' কাব্যের উৎস-সন্ধান প্রসঙ্গে প্রাচীন চীনীয় কবিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব যুগের কবি Kiu Yuan (or Chu Yan–274 BC) ও কবি Hsii Kan-এর কাব্যে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা-কর্তৃক জায়মান মেঘকে সম্বোধন করে দূর প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে প্রেমের বার্তা-নিবেদন প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু বিদগ্ধ সমালোচক উল্লিখিত এই প্রসঙ্গের কোনো প্রভাব 'মেঘদূত'-এর উপর পড়েছিল এমন অনুমান ইতিহাসসম্মত ও যৌক্তিক নয়।

একক - ৩

মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা

বিন্যাসক্রম

৬.১.৩.১ মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা
৬.১.৩.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি
৬.১.৩.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১.৩.১ : মেঘদূত ও আধুনিক গীতিকবিতা

মানবিক অনুভূতির বিশেষ এক প্রকাশরূপ হল কাব্য। আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ'-এ ভাবপ্রকাশের বিচিত্র রূপ ও রীতিকে স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজিত করে দেখিয়েছেন 'অস্ত্যন্যেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্' বলে। কবির আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ ও রীতিকে

আশ্রয় করে গড়ে ওঠে কাব্যের দেহরূপ ও আত্মরূপ। দেহরূপের বিচারে কাব্যের গঠনশৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলি এবং আত্মরূপের বিচারে রসবোধ সমাচ্ছন্ন কবিচিত্তের আনন্দময় প্রকাশরূপ প্রাধান্য পায়। কাব্য-বিশ্লেষণে প্রথমটিকে কাব্যের অভিধা এবং দ্বিতীয়টিকে কাব্যের ব্যঞ্জনা নামে চিহ্নিত করা চলে।

"কাব্যের দেহরূপের প্রকরণগত শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে প্রাচীনকালে কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। দৃশ্যকাব্য বা নাটকাদি প্রত্যক্ষগম্য বলে তা তৃপ্ত করে আদৌ দর্শক-শ্রোতার দর্শনেন্দ্রিয়কে, পরে তদতিক্রমী মননেন্দ্রিয়গুলিকে। অন্যদিকে শ্রব্যকাব্য পাঠ বা শ্রুতিনির্ভর বলে তার আবেদন স্বতন্ত্র। মেঘদূত দৃশ্যকাব্য নয়, শ্রব্যকাব্য। অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী শ্রব্যকাব্যের মূল তিনটি শাখা যথাক্রমে মহাকাব্য, কোষকাব্য ও খণ্ডকাব্য। এছাড়াও রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও শ্রব্য মহাকাব্যের পাঁচটি শাখা যথাক্রমে মুক্তক, যুগ্মক, সন্দানিক, কলাপক ও কুলক। অনুরূপভাবে দুই-তিন-চার ও পাঁচ শ্লোকের সমন্বয়ে রচিত কবিতাগুলি যথাক্রমে মুক্তক, যুগ্মক, সন্দানিক, কলাপক ও কুলক নামে চিহ্নিত।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

যাইহোক, **'মেঘদূত'কে** মহাকাব্য বলা চলে না, কেননা মহাকাব্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তা মেলে না। ভারতের রামায়ণ-মহাভারত এবং ইউরোপের ইলিয়াড ও ওডিসি—-বিশ্বের চারটি মহৎকাব্য ঘটনার ঘনঘটায়, ভাব-ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্যে বৈচিত্র্যময় সর্গবন্ধ রচনায়, নীতি ও আদর্শের জয়গানে, রহস্যে-রোমাঞ্চে, জীবনমুখিতায় মুখর মহাকাব্য এক অতুলনীয় সম্পদ এবং ভাবীকালের জাতীয় জীবনধারা ও সাহিত্য ভাবনার নিয়ন্ত্রক। অবশ্য দণ্ডীর মতো রক্ষণশীল আলঙ্কারিকও মহাকাব্যের কঠোর নিয়মবন্ধন শিথিল করে রমণীয়তা ও রসনীয়তায় পূর্ণ আস্বাদনীয় কাব্য মেঘদুতকেও মহাকাব্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।

কোষকাব্য বলতে এক বিশেষ শ্রেণীর কাব্যকে বোঝায় যা পরিসরে ক্ষুদ্র, রসসংবেদনশীল এবং মহাকাব্যের মতো বিষয়বস্তুর জটিলতা বর্জিত। কবি-নরপতি সাতবাহন হালের প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'গাহাসওসঈ' (গাথাসপ্তশতী), এবং সংস্কৃত ভাষায় লেখা গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী', কুসুমদেবের 'দৃষ্টান্তশতক', কালিদাসের 'শৃঙ্গারশতক', সংকলনগ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি এই কাব্যের দৃষ্টান্ত।

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বিধৃত স্বল্পপরিসর, খণ্ডিত, অল্পবিস্তর মহাকাব্যের লক্ষণ-সমন্বিত, অনধিক আট সর্গে রচিত কাব্যকে বলে **'খণ্ড কাব্য'**। এই সূত্রে অনেকে মেঘদূতকে 'খণ্ডকাব্য' বলে মনে করেন। রসজ্ঞ সমালোচক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মেঘদূতকে খণ্ডকাব্য বলেই মনে করেছেন। তবে খণ্ডিতকাব্য বলে নয়, শর্করা বা মিছরি খণ্ডের মতো সুমিষ্ট, রসনীয় ও আস্বাদনীয় বলে।

প্রাচীন কাব্যের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলঙ্কারিক **'সংঘাত'** নামে একপ্রকার কাব্যের কথা বলেছেন। এই শ্রেণীর কাব্যের বিশেষত্ব হল, একটিমাত্র বিষয়ের একটিমাত্র ভাষা-ছন্দে বর্ণনা। কবি মানাঙ্ক-রচিত 'বৃন্দাবন-যমক' (মাত্র ৪৩ শ্লোকে সমাপ্ত) ও কালিদাসের 'মেঘদূত' (বাদে ১১৮ শ্লোকে সমাপ্ত) 'সংঘাত' কাব্যের কক্ষায় পড়ে। এঁদের বিচারে মেঘদূত "একটিমাত্র বিষয় ও ছন্দ-নির্ভর বর্ণনাত্মক রচনা। বিশেষত মেঘদূতের বিষয় একটাই—বিরহী যক্ষের বেদনামেদুর স্মৃতিচারণা (নস্টালজিয়া), এর

ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত এবং ছন্দ আদ্যন্ত মন্দাক্রান্ত। সুতরাং মেঘদূতকে প্রাচীনের বিচারে নিঃসংশয়ে 'সংঘাত কাব্য বলা যেতে পারে।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

'মেঘদূত' কাব্যের জাতিনির্ণয় প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত আলোচনা প্রাচীনের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কাব্যের বিচার। আধুনিক যুগে কাব্যবিচারের মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে। তাই আধুনিক বিচারে মেঘদূত **গীতিকাব্য** (Lyric Poetry) ছাড়া অন্য কিছু নয়। আত্মকেন্দ্রিক, সংবেদনশীল, ভাবঋদ্ধ কবিমানসের বাঙ্ময় প্রকাশরূপকে এক কথায় গীতিকবিতা বলতে পারি। গীতিকাব্যের ও বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা—Ode, Elegy, Monody, Sonnet প্রভৃতি। মেঘদূতকে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না কেননা ভাব, বিষয়বস্তু ও রসাবেদনের দিক থেকে এগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

আধুনিক গীতিকাব্য মূলত তন্ময় (Objective) ও মন্ময় (Subjective)—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বস্তু আশ্রয়ী ও ব্যক্তি আশ্রয়ী যে ধরনের গীতিকবিতা / গীতিকাব্যই হোকনা কেন, তার মধ্যে ব্যক্তি কবির হৃদয়ের রঙ, হৃদয়ের স্পর্শ থাকা চাই। "কবির ব্যক্তি-অহং (Ego বা Self) থেকে উৎসারিত ভাবনা (Intense Personal Emotion) ব্যক্তিচিত্তের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনের রসবোধের অনুকূল হয়ে ওঠে; ব্যক্তের বীণাযন্ত্রে ধ্বনিত হয় অব্যক্তের সুরমূর্ছনা। স্বল্পাবয়বে বিধৃত আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস ও অন্তর্গূঢ় অনুভূতির প্রকাশে সমুজ্জ্বল কবিতামাত্রকেই বলতে পারি গীতিকবিতা।" (মেঘদূত জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) ব্যক্তিচেতনা নির্ভর গীতিকবিতা আবার কখনো কখনো আত্মচেতনাকে আড়ালে রেখে সমষ্টিচেতনার (Group Consciousness) দ্যোতক হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "কবিহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাবানুভূতির নিবিড়তায়, ভক্তহৃদয়ের আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতায় এই দুই সম্প্রদায়ের কাব্য সর্বজনীন সমাদর লাভ করেছে। বস্তুত বৈষ্ণব কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের উপস্থিতিতে গীতিকবিতার কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ বৈকুণ্ঠের গানের আড়ালে কবিহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে।

ঠিক অনুরূপভাবে মেঘদূত কাব্যেও যক্ষের কামনা-বিলাসের অন্তরালে কালিদাসের কবিকণ্ঠই মুখর হয়ে উঠেছে; স্পন্দিত হয়েছে কবিরই হৃদয়। আপন সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার মাধুরীমিশ্রিত সত্তার যোগে, মন্ময়তার স্পর্শে ব্যক্তি যক্ষের হৃদয়ার্তি বিশ্বের প্রবাসী প্রিয়জনের চিরন্তন বিচ্ছেদার্তির রূপক হয়ে মেঘদূতকে আধুনিক গীতিকাব্যের কক্ষায় উন্নীত করেছে। .... কবিহৃদয়ের নিরুদ্ধ বেদনাই যেন মেঘপক্ষ ভর করে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো উড়ে যেতে চায় কামনার মোক্ষধাম অলকার দিকে। তাই মেঘদূতে যক্ষের বিচ্ছেদ-ক্রন্দন ও মিলনার্তি আসলে কবির অন্তরাত্মারই আকুল ক্রন্দন, সীমাবদ্ধ জীবন থেকে অনন্ত সৌন্দর্যলোকে মুক্তির জন্য ক্রন্দন। মেঘদূতে যক্ষের ভাবছায়ায় কবিচিত্তের 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন'-এ সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে এবং কবিভাবনার ব্যাপ্তি ও তন্ময়তার স্পর্শে মেঘদূত হয়ে উঠেছে খাঁটি গীতিকাব্য, ...সাধারণ গীতিকাব্য নয়, রোমান্টিক গীতিকাব্য।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

আর শেষ কথা হল এই যে, যে আদর্শায়িত, অবাস্তব ও মনোহর স্বপ্নকল্পনার ভাবজগৎ কবি সৃষ্টি করেছেন—সেও তো কবির আত্মকামনারই ছায়ারূপ। "সেই উন্মুখ কামনার ছায়াপাতে রেবা, নির্বিন্ধ্যা,

সিন্ধু, গম্ভীরা প্রভৃতি পরিকল্পিত হয়েছে। সেই অন্তরলালিত বাসনার আলোকে যে জীবন, তার স্বরূপ বস্তু জগতে নেই, তা অবাস্তব, মনোহর এবং আছে মানসলোকে—

"আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ।

নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ॥"

—এই মাটির পৃথিবীতে থাকে না, থাকে কবির কল্পলোকে, Idea বা ভাবের জগতে। মেঘদূত এখানে একটা ভাবের জগৎ সৃষ্টি করে সার্থক গীতিকাব্য হয়েছে।" (মেঘদূত পরিচয়—৩য় সং, পৃঃ ১৬—শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য)।

একক - ৪

মেঘদূত কাব্যের নিসর্গচেতনা

বিন্যাসক্রম

৬.১.৪.১ মেঘদূত কাব্যের নিসর্গচেতনা

৬.১.৪.২ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.১.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১.৪.১ মেঘদূত কাব্যের নিসর্গচেতনা

সকল দেশের সাহিত্যেই নিসর্গ বা প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রকৃতি সাহিত্যের এক অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ-এ প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল প্রকৃতি ও মানবাত্মার অভিন্নতার মন্ত্র—'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহং পৃথিব্যাঃ।'—এই মৃত্তিকা আমার মা, আমি এই ধরিত্রীর সন্তান। সাহিত্যে প্রকৃতি যেভাবে ধরা দিয়েছে মননশীলতার বিভিন্ন পর্বে ভিন্ন দেশ-কালে, তা থেকে নিসর্গ সন্দর্শনের পর্যায়ক্রমিক উত্তরণের ধারাটি রয়েছে অব্যাহত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতিকে কখনো জড়সত্তা রূপে, আবার কখনো বা চৈতন্যময় সত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রকৃতি সেখানে কখনো নিছক ভাব-উদ্দীপনের সহায়ক বিভাব, আবার কখনো মানবিক গুণৈশ্বর্যমণ্ডিত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে উজ্জীবন্ত। একপ্রকার স্নিগ্ধ-প্রশান্ত-করুণার্দ্র অনুষঙ্গরূপে তার ব্যবহার ভারতীয় সাহিত্যের বিশিষ্টতা। নিসর্গ-প্রকৃতি ভারতীয় চেতনায় হিংস্রতার প্রতিমূর্তি হয়ে কখনো ফুটে ওঠেনি।

সাহিত্য সমালোচক Abercrombie সাহিত্যে প্রকৃতি-আশ্রিত ভাবনার উত্তরণের স্তরগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভাজিত করে বিষয়টি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। 'An outline of Modern Knowledge' গ্রন্থের 'Principles of Literary Criticism' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রকৃতি ভাবনার তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। স্তরগুলি যথাক্রমে—

(১) Concrete representation of Nature—একে বলা যেতে পারে জড় প্রকৃতির Photographic representation অর্থাৎ জড়প্রকৃতির যথাযথ স্বরূপের চিত্রায়ণ। মহাকাব্যের প্রকৃতিবর্ণনা মুখ্যত এই স্তরের। এতে সাহিত্যিক কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম করে এতটুকু এগোতে পারে না।

(২) Humanised representation of Nature—"প্রকৃতি এখানে মানবায়িত ও উজ্জীবন্ত—মানবীয় সুখ, দুঃখ, স্নেহ, প্রেম, করুণা ও পবিত্রতায় পূর্ণ। এই স্তরে প্রকৃতি মানবিক বোধের উদ্দীপনে

বিভাবরূপ কার্যকরী (Pragmatic) ভূমিকা পালন করে। কালিদাস-শেক্সপীয়র প্রভৃতির কাব্য-নাটকে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে।

(৩) Inter penetrative affinity between man and nature—এই স্তরে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবমন অভিন্নসূত্রে গ্রথিত হয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যেই এই ত্রিস্তর প্রকৃতি ভাবনার পরিচয় আছে।

"কিন্তু এছাড়াও প্রকৃতি দর্শনে আরো একধাপ উত্তরণ ঘটেছে ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যে, বিশেষত Wordsworth, Shelley, Keats প্রমুখের কাব্যে, আমাদের দেশে রবীন্দ্রসাহিত্যে। এই স্তরকে বলা যেতে পারে Idealised representation of nature। এই স্তরে প্রকৃতির আনন্দে উদ্বেল সাহিত্যশিল্পী আপন সত্তার গভীরে একটি ধ্রুব, জ্যোতির্ময়, আনন্দময়, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর রসলোক সৃজন করে বস্তুলোক থেকে আদর্শায়িত-সমুন্নত ভাবরসলোকে উত্তীর্ণ হন। প্রকৃতির আনন্দ-উল্লাস, বিস্ময় প্রভৃতির সঙ্গে মানুষের হর্ষোল্লাস একাত্ম হয়ে সৃষ্টি করে এক আনন্দ-অমৃতরসায়ন।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

মেঘদূত কাব্যে বিরহী যক্ষের 'বসন্তবিলাপ' একটা ভাব বা Idea মাত্র। "সেই ভাবের একটানা প্লাবনে মন্থর অথচ গতিশীল মেঘের পশ্চাতে উধাও হয়েছে কবির নিসর্গ-সন্দর্শন। সেই দর্শনের দুর্নিবারতায় ঢাকা পড়েছে যক্ষ ও তার প্রিয়া, মুখ্য স্থান অধিকার করেছে সকল দৃষ্টিনন্দন, মনোমোহন নিসর্গ প্রকৃতি। যক্ষের অন্তঃপ্রকৃতি, তার কল্পনা, আর বাইরের নিসর্গ প্রকৃতি একই কামনাবৃন্তে কল্পবৃক্ষের ফুল হয় ফুটে উঠেছে। পূর্বমেঘের আদি স্তরে বাসনা-কামনার দুর্মর শক্তির বিচিত্র লীলা কবি দর্শন করেছেন। একটির পর একটি দেশ, জনপদ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে কল্পনার মেঘদূত। রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত নিসর্গ-প্রকৃতির কামনামদির রূপের বর্ণনায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগের কুশলতায় কবি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন বাসনারক্তিম প্রেমের নিরবচ্ছিন্ন মহিমা। মনের গোপনে জমে থাকা কত অব্যক্ত সুখ-দুঃখের নিবিড় অনুভব, কত হাসি-কান্না, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অপরিম্লান, অনিঃশেষ রূপৈশ্বর্য কবি উজাড় করে দিয়েছেন আমাদের জন্য। রঙে-রসে-উচ্ছলতায়-ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চারপাশের ভৌমগুলি জীবনচ্ছবিকে—চির জানা-অজানা অথবা চির চেনা-অচেনা, অস্পৃষ্ট জগতের মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নলোকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। আমাদের অন্তরের সেই দেখাটাকেই কবি প্রকৃতি সান্নিধ্যে নতুন জীবনরসে সঞ্জীবিত করে দেখিয়েছেন। কবি যেন আমাদের অবরুদ্ধ কণ্ঠকেই বাণীরূপ দিয়েছেন সমগ্র মেঘদূত কাব্যে। ..... মেঘদূত একই সঙ্গে মেঘসন্দর্শন এবং মেঘের মধ্যে দিয়ে বিশ্বদর্শন।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

৬.১.৪.১.১ মেঘদূত কাব্যের চিত্রসৌন্দর্য (পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ)

মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘে যক্ষের নির্বাসনস্থল রামগিরি থেকে তার প্রিয় বাসভূমি সুন্দরী অলকাপুরী পর্যন্ত মেঘদূতের যাত্রাপথের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ভূমিকাংশের কয়েকটি শ্লোক বাদে বাকি

শ্লোকগুলিতে বিধৃত হয়েছে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগের জনপদ, রাজ্য-রাজধানী, ভূপ্রকৃতি ও মানবলোকের বিচিত্র বর্ণরূপময় উপস্থিতি। তার প্রতিটি ছবি আপাত দৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তারা যেন পরস্পর নিবিড় যোগসূত্রে আবদ্ধ নিপুণ শিল্পীর আঁকা অক্ষয় চিত্রপট। তাই সমগ্র মেঘদূত যেন একটি চিত্রশালা; কেবল চিত্রশালা নয়, সৌন্দর্যশালা। পূর্বমেঘের বিস্তারিত বর্ণনায় মেঘের যাত্রাপথবর্তী বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি-আশ্রিত শোভা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দানের মধ্যে পরিস্ফুট কবির সরস জীবনদৃষ্টিকে মোটামুটি কয়েকটি পর্বে বিভাজিত করে দেখানো যেতে পারে।—(১) শুভ যাত্রারম্ভ, (২) উজ্জয়িনীর পথে, (৩) পুনর্যাত্রা, (৪) ব্রহ্মাবর্ত ও (৫) কনখল থেকে অলকা।

(১) **শুভ যাত্রারম্ভ ঃ** বিরহী প্রেমিক যক্ষ কুটজকুসুমের অর্ঘ্য রচনা করে মেঘকে স্বাগত জানিয়েছে এবং কল্পনায় তার সঙ্গে সৌহৃদ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। অতপর রামগিরির নির্বাসনস্থল থেকে 'অলকা' নামে বসতির উদ্দেশ্যে শুরু হবে মেঘের পথ চলা। সুমন্দ বাতাস, চাতকের কূজন, সরস-কচি মৃণালদণ্ড মুখে আকাশে উড়ে চলা হংস-বলাকা শ্রেণী—নয়নাভিরাম-মনোমোহন এই দৃশ্য হবে তার শুভযাত্রার প্রেরণা। গুরু গুরু মেঘগর্জনে মাটি ফুঁড়ে অজস্র সহস্রে ফুটে উঠেছে শিলীন্ধ্রা বা কন্দলী ফুল। শস্যশালিনী হয়েছে বসুন্ধরা। "যক্ষের বার্তাবহ মেঘ কেবল যক্ষদূত নয়, সে মঙ্গলেরও দূত। সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের যোগে তার অবারিত যাত্রাপথ হয়েছে সুগম চিত্তাকর্ষক ও রমণীয়। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপদচিহ্ন-অঙ্কিত মেখলা রামগিরিকে সোহাগে নিবিড় স্নেহালিঙ্গন জানিয়ে ঘনিয়ে এসেছে মেঘের অলকা যাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রথম পর্বের সমাপ্তি এখানেই।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

(২) **উজ্জয়িনীর পথে ঃ** শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীর পুণ্যস্মৃতিবহ রামগিরিকে সম্মান ও ভক্তিপ্রদর্শন করে শুরু হল মেঘের পথ চলা। মাঝে মাঝে পাহাড়চূড়ায় বিশ্রাম, স্বচ্ছ স্রোতোস্বিনীর মিষ্টি জলপান আবার শিখরে শিখরে পা ফেলে ফেলে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়া—এই হয়েছে তার রোজনামচা। তার আগমনে মুগ্ধা, গম্ভীর গর্জনে ও দুর্বার গতিতে সন্ত্রস্তা, সরলা সিদ্ধাঙ্গনাগণ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গুহাশ্রয়ে ফিরে যাবে। ঐ দূরে উইঢিবির আড়াল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বিচিত্রবর্ণচ্ছটাসমুজ্জ্বল ইন্দ্রধনু। ভ্রান্তিবিলাস-অনভিজ্ঞা সরলা গ্রাম্যবধূদের চকিত দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত মেঘ কিছুটা পিছন ফিরে এবার আম্রকূটের দিকে এগিয়ে যাবে। আম্রকূট তাকে যথাবিহিত সমাদরে মাথায় করে রাখবে। কেননা হিতকামী বন্ধুর মতো দাবাগ্নি নিবিয়ে দিয়ে সুপক্ক আমের গন্ধে আমোদিত এই সানুমান পর্বতের মহা উপকার করেছে সে। আম্রকূটে রয়েছে বনচরবধূদের অবাধ প্রণয়ে সম্ভুক্ত কুঞ্জবন। সেখানে জলদান শেষ করেই সে যেন আম্রকূট ছেড়ে যায়।

সামনেই পড়বে বিন্ধ্যাচল। তার পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে 'রেবা' নামে ক্ষীণস্রোতা ভক্তিমতী নদীটি। মেঘ তার নির্মল সলিলসুধা পান করে যাত্রাপথের ক্লান্তি দূর করুক এবং সারবান হয়েই উড়ে চলুক। তার বর্ষণে পাহাড়ে ফুটেছে 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', নীচে থরে বিথরে কন্দলী। চলছে সারঙ্গদের শোভাযাত্রা। ঊর্ধ্বে হরিত-কপিশ বর্ণের কদম্ব পুষ্পগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে,

আর সদ্যপ্রস্ফুটিত ভুঁইচাপার কলিগুলি খেতে খেতে তারা যেন তাকে পথ দেখিয়ে চলবে। মেঘের সর্বগ্রহিষ্ণু দৃষ্টিতে একে একে ধরা পড়বে কত মনোরম দৃশ্য, পশুপাখী-জীবজন্তু। অম্ভোবিন্দু গ্রহণচতুর চাতক, সিদ্ধ ও সিদ্ধাঙ্গনা, অত্যাগসহন অমরমিথুন, কালো মেঘের নীচে ধাবমান হংসবলাকার দল, কুকুভ-সুরভি, শুক্লাপাঙ্গ সজলনয়ন কেকা। ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যোপহার ও কেকাধ্বনিরূপ স্বাগত সম্ভাষণে মুখর হবে তার পথ। সম্মুখেই দশার্ণ নামে জনপদের প্রান্তদেশে সুরভিত শ্যাম জম্বুবন। কেতকী পুষ্পের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই দশার্ণের উপবন। তার গ্রাম-পাশের বড় বড় গাছগুলিতে আশ্রয় নেওয়া পরিযায়ী পাখিদের নীড়রচনার ব্যস্ততা ও কলরবে মুখর হয়ে উঠবে এই প্রাচীন জনপদ।

দশার্ণের রাজধানী ভুবনবিদিত বিদিশা। অদূরে বয়ে চলেছে তটিনী বেত্রবতী। বিদিশার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' পাহাড় সম্ভোগশ্রান্ত মেঘের বিশ্রামস্থল। বিদিশার অরণ্য ও নদীতীরের নবজলসিক্ত পুষ্পোদ্যান, যূথীবনবিহারিণী পুষ্পলাবী বনাঙ্গনাদের 'রুজা' (কর্ণোৎপল নড়ে যাওয়ার বেদনা) মেঘকে আকর্ষণ-বিকর্ষণের এক ভিন্ন জগতে পৌঁছে দেবে। অতপর তার উজ্জয়িনী প্রয়াণ। শোভা ও সৌন্দর্যের অধিরাজ্য উজ্জয়িনী। তার সুবিশাল প্রাসাদ, অভ্রংলিহ অট্টালিকাশ্রেণী, পুরসুন্দরীদের অপাঙ্গ-ইঙ্গিত—জীবন-যৌবনের সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ উজ্জয়িনী। তার প্রবেশপথে নদী নায়িকা নির্বিন্ধ্যার চিত্ত-বিমোহক সৌন্দর্য। তরঙ্গভঙ্গে কলরবমুখরিত বিহগশ্রেণীতে রচিত হয়েছে তার চন্দ্রহার। বিভ্রম-বিলাসিনী নায়িকা এই নির্বিন্ধ্যা। আর এক বিরহিণী নদী-নায়িকা একবেণীধরা সিন্ধু মেঘের অমৃতসলিল-বর্ষণ-প্রত্যাশী।

উজ্জয়িনী অবন্তীদেশের রাজধানী। উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধের কথামালায় সমৃদ্ধ, সৌন্দর্যে-সম্পদে মহতী শ্রীবিশালা বিশালা নগরী যেন স্বর্গতুল্য—স্বর্গ থেকে ভূমণ্ডলে খসে পড়া স্বর্গীয় কান্তির এক টুকরো—'শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্'। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, চঞ্চল বাতাস, শিপ্রার বীচিক্ষুব্ধ জলধারা, ফুলের সমারোহ, পাখীর কলতানে মুখর প্রেমের দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য উজ্জয়িনী। ....শিপ্রার শরীর জুড়ানো মৃদুমন্দ বাতাস, পুররমণীদের কেশসংস্কার ধূপের সৌরভ, গৃহপালিত ময়ূর-ময়ূরীদের নৃত্যোপহার, ললিতা পুরলক্ষ্মীদের অলক্তরাগরঞ্জিত চরণক্ষেপে মণিকুট্টিমে (মেঝেতে) অঙ্কিত চরণচিহ্ন, চণ্ডীশ্বর শিবের পুণ্যধাম, জলকেলিমত্ত যুবতীদের স্নানীয় অঙ্গরাগদ্রব্যে ও পদ্মরজঃগন্ধে সুরভিত গন্ধবতী নদী, মহাকাল শিবমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে পাদবিক্ষেপে ক্বাণিতরশনা বিলাসলীলাচঞ্চলা বারাঙ্গ নাদের (দেবদাসিকাদের?) ভ্রমরশ্রেণীর মতো দীর্ঘকটাক্ষ, রক্তাক্ত গজাজিনের জন্য উন্মত্ত তাণ্ডবনিরত মহেশ্বর ও শান্তোদ্বেগ-স্তিমিতনয়না ভবানী, ...কামনাময়ী গম্ভীরা, বিদ্যুতের ক্ষীণালোকে পথচলা নিসাভিসারিকা প্রভৃতি অসংখ্য আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে উজ্জয়িনী। "জীবন-যৌবন সফল করবার যা কিছু আয়োজন তা সবই যেন থরে-বিথরে সাজানো রয়েছে উজ্জয়িনীতে। যৌবন-প্রসাধনকলার এমন বিচিত্র রূপ, বেহুঁশ করে ফেলা বর্ণগন্ধময় জগতের এমন সুতীব্র আকর্ষণ, জীবনে-যৌবনে কামনা-বাসনার রক্তরাগের সঙ্গে ভক্তিনম্র চিত্তের স্নিগ্ধ প্রশান্তির এমন সহাবস্থান শুধু ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

(৩) পুনর্যাত্রা ঃ উজ্জয়িনী থেকে মেঘের যাত্রা এবার দেবগিরির দিকে। দেবগিরি কুমার স্কন্দের নিত্য অধিষ্ঠানভূমি। সেখানকার কাননের উদুম্বর (ডুমুর)গুলিকে শীতল বায়ুসংসর্গে পাকিয়ে দিয়ে কার্তিকের বাহন ময়ূরদের গুরুগর্জনে নাচিয়ে দেবে সে। আর নিজের দেহটিকে পুষ্পমেঘে পরিণত করে আকাশগঙ্গার জল দিয়ে সেই শরবনভবকে স্নান করানোর পুণ্য অর্জন করবে। তারপর দশপরাধিপতি রন্তিদেবের অক্ষয় কীর্তি চর্মণ্বতী নদী পেরিয়ে, দশপুরবধূদের নেত্রকৌতূহল বর্ধিত করে মেঘ এগিয়ে যাবে ব্রহ্মাবর্তের দিকে।

(৪) ব্রহ্মাবর্ত ঃ মেঘ ব্রহ্মাবর্তে উপনীত। প্রাচীন আর্য উপনিবেশ ব্রহ্মাবর্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী জনপদ। এখানেই রয়েছে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র। গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের প্রতাপ প্রদর্শনের স্থল কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধের মহাপরিণামে অনুতপ্ত মহাবলী বলরামের শেষ জীবনের আশ্রয়স্থলও। এই কুরুক্ষেত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মেঘ কনখলের দিকে যাত্রা করবে।

(৫) কনখল থেকে অলকা ঃ ভক্তিস্নাত মেঘ পুণ্যতীর্থ কনখল থেকে দেবতাত্মা হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেছে। তার উদ্দেশ্য দেবাদিদেব মহাদেবের চির অধিষ্ঠান ভূমি কৈলাস। এই কৈলাসেই অলকা, এখানেই মানসসরোবর। অফুরন্ত নিসর্গ সৌন্দর্যের আকর কৈলাস। এই সৌন্দর্যের দ্রষ্টাও উপভোক্তা মেঘ মহাভাগ্যবান। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"ভব-ভবানী অধ্যুষিত হিমালয়ের স্নিগ্ধ বাতাস, সমুন্নত দেবদারু, কুটজকুসুম, নীপ, উদুম্বর, ভুজতরুবন, অষ্টপদবিশিষ্ট জন্তু শরভ, চমরী গাই, দাবাগ্নি, বিশাল উইয়ের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা, জানা-অজানা অজস্র গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশুপাখী, প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলশোভিত মানস সরোবর, হংসদ্বার, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, কীচকের সুমধুর বংশীধ্বনি-নিনাদিত কৈলাস। এই কৈলাসের ক্রোড় থেকেই রেশমী দুকূলের মতো খসে পড়া গঙ্গার সমীপবর্তী কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরী। অফুরন্ত ঐশ্বর্য ও অনন্ত যৌবনের রাজ্য যক্ষের বিলাসপুরী অলকা। তার সপ্ততল সুউচ্চ মেঘস্পর্শী হর্ম্যরাজি সুন্দরী রমণীপূর্ণ, নানা মণিকুট্টিম সমৃদ্ধ, চিত্রশোভিত, মুরজধ্বনিমুখর, নিত্যজ্যোৎস্নায় ঝলমলে, তাই প্রদোষরহিত। অলকার আকাশটিও যেন তারাফুলখচিত। সেখানকার বধূদের হাতে রয়েছে লীলাকমল, অলকে সদ্যফোটা কুন্দকলির অনুবেধ, মুখে লোধ্রফুলের পরাগরেণুতে শুভ্রশ্রী, কেশপাশে নব কুরুবক, কর্ণদ্বয়ে সুন্দর শিরীষ কুসুম আর মেঘোদয়ে প্রস্ফুটিত নীপমঞ্জরী। ....অলকার অন্য আকর্ষণ—ইন্দ্রনীল-মণিখচিত ক্রীড়াশৈল, সুগন্ধ ফুলে ভরা বাপী, কুরুবকের বেড়া দিয়ে ঘেরা মাধবীকুঞ্জ, কিশলয়যুক্ত রক্তাশোক ও মনোহর কেশর বৃক্ষ, ...মণিবাঁধানো কাঞ্চনযষ্টিতে বসে থাকা নীলকণ্ঠ ভবনশিখী, যক্ষভবনের গায়ে আঁকা শঙ্খপদ্ম চিহ্ন আর তন্বী-শ্যামা ভবনবাসিনী—

"তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং

যা তত্র স্যদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিবাদ্যেব ধাতুঃ।।" (উত্তরমেঘ ২১) (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

উদার দৃষ্টি ও সমুন্নত কল্পনায় ভাস্বর এইসকল রূপকল্পনা ও কথাচিত্র মর্ত্যের সঙ্গে স্বর্গের মাধুরীকে যুক্ত করে দিয়ে এক অসামান্য শিল্পরসে পাঠক মন ভরিয়ে তোলে। বর্ণসৌন্দর্য সুষমা-নিরীক্ষণ ও চিত্রসৌন্দর্য নির্মাণে কবির দক্ষতা অতুলনীয় ও অপূর্ব। তাই মনে হয় সমগ্র মেঘদূত যেন একটি চিত্রশালা, কেবল চিত্রশালা নয়, সৌন্দর্যশালা। সমালোচক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল চিত্র পরম্পরায় ..... কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।" (কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা)

। ৬.১.৪.১.২মেঘদূত কাব্যে প্রকৃতি - নদী - নারী

ভারতীয় মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান জড়ের মধ্যে চৈতন্যের আবিষ্কার। ঋষিকবি বলেছেন, জড় বলে কিছু নেই, সবই প্রাণময়, চেতনাময়। বাহ্যদৃষ্টিতে নয়, সূক্ষ্মবোধ ও অন্তর্দৃষ্টিতে এ সত্য ধরা পড়ে। আরও একটি সমুন্নত কল্পনা—বিশ্বপ্রকৃতিতে জননী অথবা জায়ারূপে কল্পনা। ঋষিকবির উপলব্ধি—'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ'।—এই মাটি আমার মা, আমি এই ধরিত্রীর সন্তান। কালিদাসের সকল সৃষ্টির মধ্যেই ঋষিকবির সেই সত্যের বিঘোষণ দেখা গেছে।

মেঘদূত কাব্যে কবি জড়প্রকৃতির বাইরের নয়নলোভন দৃশ্যাবলীর বর্ণনা উপস্থাপিত করেছেন। এই সকল মনোরম দৃশ্য অপরূপ চিত্রসৌন্দর্যের দ্বারা আমাদের মনকে স্পর্শ করে। কিন্তু সেই সকল বর্ণনা আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অনেক সময়ই তারা জড়স্বভাব-অতিক্রমী প্রাণবান সত্তা-চেতনার পরিচয় দিতে পারে না। এক্ষেত্রে এই কাব্যে ব্যবহৃত নদীগুলির উল্লেখ ব্যতিক্রম। মেঘদূতের নদীগুলি কেবল জড়প্রকৃতির অসংখ্য উপাদানের অন্যতম উপাদান মাত্র নয়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অলঙ্কারসমৃদ্ধ নদীগুলি সেখানে নিছক তটিনী নয়, রক্ত-মাংসের শরীর ও উত্তাপ-আবেগ-অনুভবদীপ্ত প্রেমিকা রমণী। রেবা, নর্মদা, নির্বিন্ধ্যা, শিপ্রা, গম্ভীরা, সিন্ধু, জাহ্নবী, চর্মন্বতী, গঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতি নদীগুলি কেবল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক সত্য নয়, তারা ভক্তিমতী, কামনা-বাসনাময়ী নদী-নায়িকা। প্রেমের দশ দশার বিভিন্ন দশাগ্রস্ত এই সকল নদী-নায়িকারা আসলে প্রেমিকপ্রবর নায়ক মেঘের মিলন-প্রত্যাশী প্রোষিতর্তৃভর্তৃকা বিরহিণী নায়িকা। এই সকল নায়িকার রূপালেখ্য নির্মাণে মহাকবি অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কালিদাস-অনুরাগী কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকৃতি-নদী-নারী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

উজ্জীবনী পাঠ

মেঘদূত (পূর্বমেঘ)-এর শ্লোক সংখ্যা ৬৪ (প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে)। সমগ্র পূর্বমেঘ-এর শ্লোকাবলীর উজ্জীবনী অংশ যোগ করার সুযোগ নির্দেশিকা-আলোচনায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ পূর্বমেঘের প্রথম ১০টি শ্লোকের মূল, অন্বয়, শব্দার্থ, অন্বয়ার্থ ও উজ্জীবনী এখানে দেওয়া হল। অনুরূপভাবে সকল শ্লোক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত হতে হবে।

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥১॥

অন্বয় ঃ স্বাধিকারপ্রদত্তঃ কাশ্চিৎ যক্ষঃ কান্তাবিরহগুরুণা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃশাপেন অস্তংগমিতমহিমা সন্ জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু রামগির্যাশ্রমেষু বসতিং চক্রে।

শব্দার্থ ঃ স্বাধিকারপ্রমত্ত—নিজের অধিকার বা কর্তব্যে প্রমাদযুক্ত অর্থাৎ অমনোযোগী, কশ্চিৎ যক্ষ—কোনো এক যক্ষ, কান্তাবিরহগুরুণা—কান্তার বিরহজনিত গুরু অর্থাৎ সুদুঃসহ, বর্ষভোগ্যেণ—এক বৎসরব্যাপী ভোগ্য, ভর্তুঃশাপেন—প্রভুর অভিশাপে, অস্তংগমিতমহিমা—অস্তমিত হয়েছে মহিমা অর্থাৎ তেজ, প্রভাব বা ঐশ্বর্য এমন, (সন্-হয়ে), জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু—জনকতনয়া সীতার স্নানে পুণ্য বা পবিত্র হয়েছে সলিল যার (এমন), স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু — স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহযুক্ত ছায়াপ্রধান তরুশ্রেণী বেষ্টিত, রামগির্যাশ্রমেষু—রামগিরির আশ্রমে অর্থাৎ আশ্রয়যোগ্যস্থলে, বসতিং চক্রে—বাস করেছিল।

অন্বয়ার্থ ঃ নিজের কর্তব্যে অমনোযোগী এক যক্ষ প্রিয়াবিরহে বর্ষকালভোগ্য প্রভুপ্রদত্ত অভিশাপে ঐশ্বর্যহীন হয়ে জনকতনয়া সীতার স্নানে পবিত্রসলিল, স্নেহময় ছায়াতরুঘেরা রামগিরির আশ্রমে বাস করেছিল ॥ ১॥

উজ্জীবনী ঃ স্বাধিকার—স্ব-অধিকার, অর্থে পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, কাজের বিষয়, পালনীয় কর্তব্য প্রভৃতি। এ থেকেই আধিকারিক-তত্ত্বাবধায়ক, পরিদর্শক ইত্যাদি। প্রমত্তঃ—অনবহিত-'প্রমত্তোহনবহিতঃ প্রমাদোহনবধানতা'—বলেছেন অমরকোষ। স্বাধিকারপ্রমত্তঃ বলতে এখানে নিজের অধিকারে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান বা কাজের বিষয়ে অমনোযোগী বোঝানো হয়েছে। কশ্চিৎ যক্ষঃ বলার কারণ

কোনো বিশেষ যক্ষ নয়, নির্বিশেষ বা সাধারণ (Universal) যক্ষ। বিশেষের (Particular) সামান্যীকরণের (Universalisation) দ্বারা কবি মেঘদূতকাব্যে যক্ষের বিরহকে চিরন্তন 'কান্তা-বিরহের' কাব্য করে তুলেছেন। ভর্তুঃ শাপেন — প্রভুর শাপে। টীকাকারগণের মতে এই প্রভু যক্ষের নিয়োগকর্তা ধনপতি কুবের। প্রাচীন টীকানুসারে জানা যায়—প্রভু কুবেরের প্রাত্যহিক শিবার্চনার ফুল যোগান দেওয়া ছিল যক্ষের কাজ। একদা প্রিয়াসঙ্গে আত্মবিস্মৃত হয়ে সে নিত্যকর্মে গাফিলতি করে। অমনি বর্ষিত হয় প্রভুর নির্মম অভিশাপ। প্রাচীন ভারতে কর্তব্যে কোনোপ্রকার অবহেলা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতো। তাই যক্ষের শাস্তি। যক্ষ—ধনাধিপতি কুবেরের সহচর, রক্ষক, উদ্যান-পালক দেবযোনী বিশেষ। ঋগ্বেদে (৭.৬১.৫) ও কেনোপনিষদে (১৫) 'পূজ্য' অর্থে যক্ষ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, পিশাচ, গুহাবাসী, সিদ্ধ প্রভৃতি দেবযোনী — 'বিদ্যাধরাপ্সরো যক্ষরক্ষোগন্ধর্বকিন্নরাঃ। পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোহমী দেবযোনয়ঃ।।' (অমরকোষ) কামনা করা হয় বলেই কান্তা < √ কম্। কান্তা, কান্তি, কামিনী প্রভৃতি শব্দগুলির মূলে রয়েছে এই ধাতু। রামগিরি — পর্বত বিশেষ — যক্ষের নির্বাসনস্থল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে মধ্যপ্রদেশের সরগুজা জেলার অন্তর্গত রামগড়, পণ্ডিত Wilson- এর মতে নাগপুরের সন্নিকটে 'রামটেক' (মারাঠী ভাষায় 'টেক্' অর্থে পাহাড়); মেঘদূতের প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ ও বল্লভদের ভাষ্যে মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট পর্বত, আবার কারো কারো অনুমান, বিহারের রাঁচী জেলার রামগড় পাহাড়। আসলে যক্ষ, যক্ষপুরী, অলকা প্রভৃতির মতো রামগিরিও নির্বিশেষ কাল্পনিক কোনো গিরিস্থল বলেই মনে হয়। মহিমা — তেজ, প্রভাব, ঐশ্বর্য; মল্লিনাথ অর্থ করেছেন সামর্থ্য। ছায়াতরু — পুন্নাগবৃক্ষ, নমেরুবৃক্ষ; 'ছায়াবৃক্ষো নমেরু স্যাৎ' বলেছেন শব্দার্ণব। এই বৃক্ষের ফল থেকে রুদ্রাক্ষমালা তৈরি হয়। রামগির্যাশ্রমেষু — রামগিরির আশ্রম বা আশ্রয়স্থলগুলিতে। একটি নির্দিষ্ট আশ্রমে প্রেমোন্মাদ-চঞ্চল যক্ষের অবস্থান স্বাভাবিক নয়, তাই বহুবচন।

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাপ্রিযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥২॥

অন্বয় ঃ অবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ (সন্) তস্মিন্ অদ্রৌ কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আশ্লিষ্টসানুং মেঘং বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং (ইব) দদর্শ।

শব্দার্থ ঃ অবলাবিপ্রযুক্তঃ—প্রিয়া বিরহিত, প্রিয়া-বিচ্ছিন্ন, স কামী—সেই প্রেমার্ত যক্ষ, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ—স্বর্ণকঙ্কণ স্খলিত হয়ে পড়ায় শূন্য হয়েছে প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ হাতের মণিবন্ধ বা কব্জি (Wrist) যার (এমন হয়ে), তস্মিন্ অদ্রৌ — সেই পর্বতে (রামগিরিতে), কতিচিৎ মাসান্ নীত্বা—কয়েক মাস কাটিয়ে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিতে, আশ্লিষ্টসানুং মেঘং—পর্বতের সানুদেশ (নিতম্ব) আলিঙ্গন করছে এমন মেঘকে, বপ্রক্রীড়া—উৎখাতলীলায়, পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়ং—উন্মত্ত নতদেহ গজের মতো (সুন্দর), দদর্শ—দেখল।

অন্বয়ার্থ ঃ অবলা বা প্রিয়া-বিরহিত সেই প্রেমার্ত যক্ষের মণিবন্ধ (হাতের কব্জি) স্বর্ণকঙ্কণশূন্য (অর্থাৎ রুগ্‌ণ বা কৃশ) হয়ে পড়েছিল। (এই অবস্থায়) সেই পর্বতে কয়েকমাস কাটিয়ে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিতে পর্বতের সানুদেশ-(নিতম্ব) আলিঙ্গনরত মেঘকে উৎখাতলীলায় উন্মত্ত নতদেহ গজের মতো (সুন্দর) দেখল ।।২।।

উজ্জীবনী ঃ অবলা—স্ত্রীবাচক শব্দ—"স্ত্রীযোষিদবলানারীবধূঃ সীমন্তিনী সমা। প্রতীপদর্শিনীবামা ললিতা বনিতা তথা।।" (অমরকোষ) অর্থাৎ স্ত্রী যোষিৎ, অবলা, নারী, বধূ, সিমন্তিনী, সমা, প্রতীপদর্শিনী, বামা, ললিতা, বনিতা প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দ। বিপ্রযুক্তঃ—বিচ্ছিন্ন, বিরহিত < সং বিপ্রয়োগঃ — বিচ্ছেদ বিরহ। কামী — কামনা আছে যার অর্থাৎ কামুক। কিন্তু আমাদের বিচারে যক্ষ কামুক নয়, প্রেমিক, তাই প্রেমার্ত। ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ—কৃশ মণিবন্ধ—দশটি কামদশার অন্যতম দশা কৃশতা — "দৃঙ্-মন-সঙ্গ-সংকল্পো জাগরঃ কৃশতারতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্ছাস্তাঃ ইতিস্মরদশা দশঃ।।" (অমরকোষ) এখানে পঞ্চম দশা কৃশতা। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে—কোনো কোনো টীকাকারের মতে এই পাঠ অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ 'আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে' অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শেষদিনে। তাঁদের যুক্তি হল — চতুর্থ শ্লোকে 'প্রত্যাসন্নে নভসি' অর্থাৎ নভঃ বা শ্রাবণ মাস প্রত্যাসন্ন হলে — এই কথা বলা হয়েছে। অতএব 'প্রথম দিবসে' পাঠ যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু মল্লিনাথ 'প্রথম দিবসে' পাঠ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর ভাবটা এইরকম— আষাঢ় এলে শ্রাবণ আসতে আর কদিন?—অনেকটা যেন ইংরেজী কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি 'If winter comes, can spring be far behind'-এরই পূর্বধ্বনি। তুলনীয়—'কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথমদিবসে' ('মেঘদূত'-মানসী—রবীন্দ্রনাথ) অথবা 'এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস।' ('অবিনয়' ক্ষণিকা)। আশ্লিষ্টসানু < আশ্লেষ — আলিঙ্গন, রভস, সানু — পর্বতের সমতল শিখরদেশ, বপ্রক্রীড়া — উৎখাতকেলি, শব্দার্ণব-অনুসারে 'উৎখাতকেলিঃ শৃঙ্গারাদ্যৈর্বপ্রক্রীড়া নিগদ্যতে'—হস্তিবৃষ প্রভৃতি জন্তুর শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকা উৎখনন-ক্রিয়া। বর্ষাকালে বৃষ্টিভেজা পাথুরে মাটিতে দাঁত অথবা শিংয়ের ঢুঁ মেরে বন্যপ্রাণীরা খেলা করে, এরই কাব্যিক নাম 'বপ্রক্রীড়া' পরিণত—সম্যকরূপে নত অর্থাৎ আনত বা অবনত, মল্লিনাথ অর্থ করেছেন-তির্যগ্‌দন্ত-প্রহাররত।

তথ্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধান হেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।।৩।।

অণ্বয় ঃ রাজরাজস্য অনুচরঃ অন্তর্বাষ্পঃ (সন্) কৌতুকাধানহেতোঃ কথমপি তস্য পুরঃ স্থিত্বা চিরং দধ্যৌ। মেঘালোকে (সতি) সুখিনঃ অপি চেতঃ অন্যথাবৃত্তি ভবতি। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে দূরসংস্থে (সতি) কিং পুনঃ?

শব্দার্থ ঃ রাজরাজস্য—রাজ — যক্ষ, যক্ষের রাজা যিনি তাঁর অর্থাৎ যক্ষরাজ কুবেরের, অনুচরঃ —ভৃত্য অর্থাৎ যক্ষ, অন্তর্বাষ্প—অন্তরে নিরুদ্ধ অশ্রুতে আর্দ্র, সন্ — হয়ে, কৌতুকাধানহেতোঃ — অভিলাষ বা কামনা-উদ্রেককারী, তস্য — সেই মেঘের, পুরঃ—সম্মুখে,

কথমপি — কোনো প্রকারে, স্থিত্বা—থেকে, চিরং—দীর্ঘক্ষণ, দধ্যৌ—ধ্যান করল অর্থাৎ ভাবল, মেঘালোকে (সতি)—মেঘ সন্দর্শনে, সুখিনঃ অপি চেতঃ—সুখীদের চিত্তও, অন্যথাবৃত্তি—আনমনা, অন্যপ্রকার, ভবতি—হয়ে যায়। কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে—কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক ব্যক্তি, দূরসংস্থে (সতি)—দূরে থাকলে, কিং পুনঃ—আর কথা কি?

অন্বয়ার্থ ঃ যক্ষরাজ কুবেরের সেই অনুচর (ভৃত্য) অন্তরে অন্তরে নিরুদ্ধ অশ্রুতে আর্দ্র হয়ে অভিলাষ বা কামনা উদ্রেককারী সেই মেঘের সম্মুখে কোনো প্রকারে থেকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ভাবল। (কারণ) মেঘ সন্দর্শনে সুখীদের চিত্তও আনমনা হয়ে যায়। (সেক্ষেত্রে) কণ্ঠালিঙ্গনে উৎসুক ব্যক্তি দূরে থাকলে তার কথা আর কি বলব? ।।৩।।

উজ্জীবনী ঃ রাজরাজস্য—এখানে পরপর দুটি 'রাজ' শব্দের প্রথমটি বিশেষ্য হয়েও দ্বিতীয় 'রাজ' শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, অর্থ যক্ষ—'রাজা প্রভৌ নৃপে চন্দ্রে যক্ষে ক্ষত্রিয়শক্রয়ো'—বলেছেন বিশ্বকোষ। এইসূত্রে রাজরাজস্য—রাজার রাজার অর্থাৎ যক্ষরাজ ধনাধিপতি কুবেরের। 'রাজরাজো ধনাধীপঃ'—বলেছেন অমরকোষ। কৌতুকাধান হেতোঃ—কৌতুক—কামনা বা অভিলাষ উদ্রেকের কারণ, বিশ্বকোষে কৌতুক শব্দের অর্থ করা হয়েছে অভিলাষ—'কৌতুকং চাভিলাষে স্যদুৎসবে নর্মহর্ষয়োঃ।'

প্রত্যাসন্নে নভসি দায়তাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ।।৪।।

অন্বয় ঃ নভসি প্রত্যাসন্নে (সতি) দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী সঃ জীমূতেন স্বকুশলময়ীং প্রবৃত্তিম্ হারয়িষ্যন্ প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ প্রীতঃ (সন্) প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।

শব্দার্থ ঃ নভসি—শ্রাবণ মাস, প্রত্যাসন্নে (সতি)—প্রত্যাসন্ন হলে, এগিয়ে এলে-দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী—দয়িতা-জীবিত-আলম্বন-অর্থী—দয়িতা—ভার্যা বা প্রেয়সীর জীবনরক্ষায় অভিলাষী, সঃ—সেই যক্ষ, জীমূতেন—মেঘদ্বারা, স্বকুশলময়ীং-—নিজের কুশলময়, প্রবৃত্তিম — বার্তাকে, হারয়িষ্যন্—বহন করাতে ইচ্ছুক হয়ে; প্রত্যগ্রৈঃ—সদ্য প্রস্ফুটিত, কুটজকুসুমৈঃ — কুটজকুসুম বা কুর্চিফুলের দ্বারা, কল্পিতার্ঘায়—অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে এমন, তস্মৈ—তাকে অর্থাৎ মেঘকে, প্রীতঃ (সন্) —প্রীত হয়ে, প্রীতিপ্রমুখবচনং—প্রীতিসম্ভাষণ, স্বাগতং—স্বাগত অভিবাদন, ব্যাজহার—জানাল।

অন্বয়ার্থ ঃ শ্রাবণমাস প্রত্যাসন্ন হলে দয়িতার জীবনরক্ষায় অভিলাষী সেই যক্ষ মেঘ দ্বারা নিজের কুশল-বার্তা বহন করাতে (অর্থাৎ প্রেরণ করতে) ইচ্ছুক হয়ে সদ্য প্রস্ফুটিত কুটজকুসুমের (কুর্চি ফুলের) দ্বারা দত্তার্ঘ্য সেই মেঘকে প্রীতিপূর্বক 'স্বাগত' রূপ সাদর সম্ভাষণ জানাল ।।৪।।

উজ্জীবনী ঃ নভসি—শ্রাবণমাস—'নভাঃ শ্রাবণিকাশ্চ' বলেছেন অমরকোষ, মূল অর্থ—আকাশ। জীমূত — জীব + মূত—পৃষোদরাদি শব্দ, 'ব' লোপে জীমূত। জীব মূত—বদ্ধ হয় যার দ্বারা অর্থাৎ জলবর্ষী মেঘ। বর্ষাকালে জীব এর দ্বারা গৃহবন্দী হয়ে থাকে, তাই জীমূত। অন্য অর্থও করা যায়।

জীমূত — জীব + মূত < সং মুক্ত > মুত্ত > মূত—যার দ্বারা জীব মুক্ত হয়। মেঘ এসে জীবের মনকে গৃহবদ্ধ জীবন থেকে বাইরে আকর্ষণ করে। পূর্ব মেঘের তৃতীয় শ্লোকে এরই পূর্বাভাষ — 'মেঘালোকে ভবতিসুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ।' তু. 'কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে 'অন্যথাবৃত্তি চেতঃ', সেই যে পথ চেয়ে থাকা আনমনা, তারই গান হবে।' (নটরাজ—রবীন্দ্রনাথ)। প্রবৃত্তি—বার্তা—'বার্তা প্রবৃত্তির্বৃত্তান্তঃ' বলেছেন অমরকোষ। কুটজ-কুর্চি, হলায়ুধ অর্থ করেছেন গিরিমল্লিকা—'কুটজো গিরিমল্লিকা।'

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়াঃ।
ইত্যোৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥৫॥

অন্বয় ঃ ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ মেঘঃ ক্বঃ; পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়া সন্দেশার্থাঃ ক্ব? ঔৎসুকাৎ ইতি অপরিগণয়ন্ গুহ্যকঃ তং যযাচে। চেতনাচেতনেষু কামার্তাঃ হি প্রকৃতিকৃপণাঃ (ভবন্তি)।

শব্দার্থ ঃ ধূমজ্যোতিঃ—ধূম (বাষ্প-ধোঁয়া) ও জ্যোতিঃ—তেজ বা সূর্যকিরণ, সলিলমরুতাং—জল ও বায়ুর, সন্নিপাতঃ—সংমিশ্রণ, মেঘঃ ক্ব—মেঘই বা কোথায়! পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ—পটু—শক্ত বা সমর্থ, করণ—ইন্দ্রিয়শক্তি বিশিষ্ট, প্রাণিভিঃ—প্রাণীদের দ্বারা, প্রাপণীয়া—প্রেরণযোগ্য, সন্দেশার্থাঃ ক্ব—সন্দেশ-অর্থাঃ— সন্দেশ বা সংবাদের উপযোগী বিষয়ই বা কোথায়! ইতি—তাই, ঔৎসুক্যাৎ—ঔৎসুক্য বা ইচ্ছাপূরণে, অপরিগণয়ন্—কৃতোদ্যম হয়ে, গুহ্যক—গুহাবাসী (যক্ষ), তং যযাচে—সেই মেঘকে প্রার্থনা জানাল। চেতনাচেতনেষু—চেতন—অচেতনেষু—চেতন ও অচেতনের বিচারে, কামার্তাঃ হি—কামার্তগণ, হি— সংযোজক অব্যয়, প্রকৃতিকৃপণাঃ—প্রকৃতি-স্বভাব, কৃপণা— কৃপার পাত্র (বহুবচন), (ভবন্তি হয়ে থাকে)।

অন্বয়ার্থ ঃ ধূম, জ্যোতিঃ, জল ও বায়ুর সংমিশ্রণ সেই মেঘেই বা কোথায়! (আর) সমর্থ ইন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট প্রাণীদের দ্বারা প্রেরণযোগ্য বার্তা বা সংবাদই বা কোথায়! তাই ঔৎসুক্য বশত (ইচ্ছাপূরণে) কৃতোদ্যম হয়ে গুহাবাসী যক্ষ সেই মেঘকে প্রার্থনা জানাল। চেতন ও অচেতনের বিচারে কামার্তগণ স্বভাবতই কৃপার পাত্র হয়ে থাকে॥৫॥

উজ্জীবনী ঃ সন্নিপাত — সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষ, (Permutation and Combination), ধূম (বাষ্প-ধূম), জ্যোতিঃ, বায়ু ও জল—মেঘের চারটি উপাদান। সন্দেশ—মূল অর্থ সংবাদ, পরে অর্থ পরিবর্তনে মিষ্টান্ন। প্রাচীনকালে আত্মীয় বাড়িতে সংবাদ পরিবেশনের তত্ত্বের সঙ্গে মিষ্টান্ন পাঠানো হত। এ থেকেই পরবর্তীকালে 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ হয়ে দাঁড়ায় আদৌ যে কোনো মিষ্টান্ন, পরে বিশেষ এক শ্রেণীর মিষ্ট দ্রব্য। গুহ্যক—গুহ্য + স্বার্থে ক। 'গুহায়াং ভব ইতি গুহ্যঃ—গুহাবাসী, বিশেষার্থে যক্ষপতি কুবেরের নিধিরক্ষক (Treasurer)—'নিধিং রক্ষন্তি যে যক্ষাস্তে স্যুর্গুহ্যকসংজ্ঞকাঃ' বলেছেন অমরকোষ। কামার্তা—কাম পীড়িত, এখানে প্রেমার্ত, কারণ যক্ষের কামনা কোনো প্রাকৃত নায়কের সাধারণ কামপীড়া

বা Passion মাত্র নয়, কামের মহিমান্বিত-ঊর্ধ্বায়িত (Sublimated) প্রেম। কালিদাসোত্তর কালে বৈষ্ণব কবিমনীষীর অনুভবে কাম ও প্রেমের এই পার্থক্য অনেকটাই সুপরিস্ফুট হয়েছে—'সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) এই কামক্রীড়াসাম্যের গুণেই প্রাকৃত কাম বৈষ্ণবের ভাব-বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমে পরিণত হয়। কৃপণ—সাধারণ অর্থ অর্থগৃধ্নু, কঞ্জুস, এখানে বিশেষার্থে কৃপার পাত্র, কৃপার্হ। 'কৃপণাঃ ফলহেতবঃ'—ফলাকাঙ্ক্ষীরা কৃপার পাত্র—গীতায় একথা বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। করণ—ইন্দ্রিয়। চেতনাচেতনেষু-চেতন-অচেতনের বাছবিচার না করে। যক্ষ পত্নীবিরহে বাহ্যজ্ঞান-বিস্মৃত প্রেমের নবম দশাগ্রস্ত 'উন্মাদ'। কথায় বলে, 'পাগলে কি না বলে?' গ্রীক পুরাণের সংস্কার—'Eros is blind'—প্রেমার্তরা অন্ধ। প্রেমের এই উন্মত্ত আর্তির কথা স্মরণ করেই 'Midsummer Nights Dream'-এ—Shakespeare মন্তব্য করেছেন—

> "The lunatic the lover and the poet
> Are of imagination all compact."

কালিদাসের 'যক্ষ একাধারে উন্মাদ, প্রেমিক এবং কবি' (মেঘদূত পরিচয়—পাবর্তীচরণ ভট্টাচার্য)। সে যেন চণ্ডীদাসের কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী রাধার মতো 'হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে কি কহে দুহাত তুলি।' তাই তার ভাবদৃষ্টিতে জড় ও চেতনের মধ্যে ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত। তাছাড়া আলঙ্কারিক ভামহ অব্যক্তবাকদের দিয়ে দৌত্যকার্য নিষেধ করেছিলেন। কারণ তাতে অযুক্তিমদ্ দোষ হয়। যক্ষকে পাগল বানিয়ে কালিদাস অযুক্তিমদ্ দোষের প্রবক্তা ভামহকে এড়িয়ে গেছেন। কারণ পাগলের কোনো শাস্ত্র মানার দায় নেই।

জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা॥৬॥

অন্বয় ঃ পুষ্করাবর্তকানাং ভুবনবিদিতে বংশে জাতং, মঘোনঃ কামরূপং প্রকৃতিপুরুষং ত্বাং জানামি। তেন বিধিবশাৎ দূরবন্ধুঃ অহং ত্বয়ি অর্থিত্বং গতঃ। অধিগুণে মোঘা যাচ্ঞা (অপি) বরম্, (পরং) অধমে লব্ধকামা (যাচ্ঞা) ন।

শব্দার্থ ঃ পুষ্করাবর্তকানাং—পুষ্কর-আবর্তক প্রভৃতি, ভুবনবিদিতে বংশে—ভুবনখ্যাত (মেঘের) বংশে, জাতং—জাত, মঘোনঃ—দেবরাজ ইন্দ্রের, কামরূপং—ইচ্ছাধীন বিচিত্র রূপধারণে সমর্থ, প্রকৃতিপুরুষং—প্রধান পুরুষরূপে (অনুচর), ত্বাং জানামি—তোমাকে জানি, তেন—তাই, বিধিবশাৎ—বিধির নির্বন্ধে, কপালদোষে, দূরবন্ধুঃ অহং—বন্ধুঃ—প্রিয়জন, দূরবন্ধুঃ—দূরবর্তী প্রিয়জন অথবা প্রিয়জন থেকে দূরবর্তী, অহং—আমি, ত্বয়ি—তোমাতে অর্থাৎ তোমার কাছে, অর্থিত্বং—প্রার্থী, গতঃ—হয়েছি, অধিগুণে—গুণবানের কাছে, মোঘা—নিষ্ফল, যাচ্ঞা—প্রার্থনা, (অপি—বরং) বরম—শ্রেয়, ভালো, (পরং—কিন্তু), অধমে—অধম ব্যক্তিতে অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছে, যাচ্ঞা—প্রার্থনা, ন — নয়।

অন্বয়ার্থ ঃ পুষ্কর-আবর্তক প্রভৃতি ভুবনখ্যাত (কুলীন মেঘের) বংশজাত, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রকৃতি-পুরুষ (প্রধান অনুচর), যথেচ্ছ বিচরণশীল তোমাকে আমি জানি। তাই কপালদোষে (বিধিবশে) প্রিয়জন থেকে দূরবর্তী (প্রিয়াবিচ্ছিন্ন) আমি তোমার কাছে প্রার্থী হয়েছি। (কেননা) গুণবানের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হওয়াও বরং শ্রেয়, (তথাপি) (নির্গুণ) অধম ব্যক্তির কাছে প্রার্থনায় সফল হওয়া নয়॥৬॥

উজ্জীবনী ঃ পুষ্করাবর্তকানাং—পুষ্কর, আবর্ত (ক), সংবর্ত, দ্রোণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মেঘের উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। এরা প্রলয়-পয়োধিসৃষ্টিকারী, বলেছেন পূর্ণসরস্বতী—'পুষ্করাবর্তকা নাম প্রলয়সমাধিকারিণো মহান্তঃ পয়োধরবিশেষাঃ।' আবহ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত মেঘের প্রধান চারটি শ্রেণী—Cirrus (wisp), Cumulus (Heap), Stratus (sheet) ও Nimbus (the black and shapless rain-cloud) পুষ্কর, আবর্ত প্রভৃতি মেঘেরই অর্বাচীন নাম। কামরূপ—যথেচ্ছ রূপ গ্রহণকারী ও বিচরণশীল। লঘু-গুরু নির্বিশেষে রক্ত, শ্বেত, পীত, পাটল প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণ-রূপ গ্রহণকারী মেঘ প্রকৃতার্থে কামরূপ। মঘোনঃ—মঘবন্(ইন্দ্র) শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, অর্থ—ইন্দ্রের, প্রকৃতিপুরুষ—প্রধান পুরুষ। মেঘকে প্রধান পুরুষ বলার কারণ, দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে এই পর্জন্যদেব বৃষ্টিদান করে জগৎকে শস্যশালিনী করে তোলেন। বর্ষণ থেকেই অন্ন, আর অন্ন থেকেই জীবন—'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি, পর্জন্যাদ্ অন্নসম্ভবঃ।' বিশ্বহিতে জলবর্ষী মেঘের এই জীবন্মুখী ভূমিকার জন্যই সে ইন্দ্রের প্রধান সহচর—দক্ষিণহস্ত, তাই প্রকৃতিপুরুষ।

অন্য আর এক দিক থেকেও মেঘ প্রকৃতির রাজ্যে প্রধান পুরুষ। সমগ্র পূর্বমেঘ জুড়ে মানব-প্রকৃতি ও নিসর্গ-প্রকৃতির বিচিত্র লীলার সহচর এই মেঘ। দুঃখে, আনন্দে, সোহাগে, সমবেদনায়, কল্যাণে, প্রেমে লিখিল মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির উপর তার অমৃত-আশিস্‌ধারা ঝরে পড়ছে। প্রকৃতির প্রধান পুরুষ মেঘ ছাড়া আর কে? সমালোচক ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "তিনি (কালিদাস) এখানে মেঘকে প্রকৃতির প্রধান পুরুষরূপে দেখেছেন—এবং এখান থেকে আগাগোড়া দেখে যাবেন। প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে শোভা-সৌন্দর্য, আনন্দ-উৎসাহ সব এনে দিচ্ছে এই প্রকৃতি - পুরুষ—ভুবনবিদিত অভিনব মেঘ।" ('মেঘদূত পরিচয়'—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য) দূরবন্ধুঃ—বধ্নাতি ইতি বন্ধুঃ—যে বন্ধন করে সেই বন্ধু, বন্ধু > বঁধূ, মূলে রয়েছে ঐ √বনধ্, অর্থ বন্ধন করা। দূরে বন্ধুর্যস্য সঃ দূরবন্ধুঃ—যার বন্ধু দূরে রয়েছে তিনি দূরবন্ধু, এখানে যক্ষের ক্ষেত্রে বিযুক্তভার্য অর্থাৎ দয়িতা-বিচ্ছিন্ন যক্ষের বিশেষণ।

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা॥৭॥

অন্বয় ঃ পয়োদ! ত্বং সন্তপ্তানাং শরণম্ অসি। তৎ ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য মে সন্দেশং প্রিয়ায়াঃ হর। বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা যক্ষেশ্বরাণাং অলকা নাম বসতিঃ তে গন্তব্যা।

শব্দার্থ ঃ পয়োদ—পয়ঃ (জল) দান করে যে, জলবর্ষী মেঘ, ত্বং—তুমি, সন্তপ্তানাং—সন্তপ্তগণের, শরণং অসি—শরণ বা আশ্রয় হও, তৎ—সেই কারণে, ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য—

ধনপতির (কুবেরের) ক্রোধে (প্রিয়া) বিচ্ছিন্ন, মে—আমার, সন্দেশং—বার্তা, প্রিয়ায়াঃ—প্রিয়ার জন্য, হর—হরণ কর অর্থাৎ নিয়ে যাও, বাহ্যোদ্যানস্থিত—বাইরের উদ্যানস্থিত, হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা—মহাদেবের মস্তকাশ্রিত চন্দ্রালোকে বিধৌত অট্টালিকা (-শোভিত), যক্ষেশ্বরাণাং—যক্ষেশ্বরের (কুবেরের), অলকা নাম বসতিঃ—অলকা নামে বসতি, তে—তোমার, গন্তব্যা—গন্তব্যস্থল।

অন্বয়ার্থ ঃ ওগো জলদ! সন্তপ্তগণের আশ্রয় তুমি! তাই ধনপতি কুবেরের ক্রোধে প্রিয়া-বিচ্ছিন্ন আমার বার্তা (আমারই) প্রিয়ার জন্য (কাছে) নিয়ে যাও। বাইরের উদ্যানস্থিত, মহাদেবের মস্তকাশ্রিত চন্দ্রালোক-বিধৌত অট্টালিকাশোভিত, যক্ষেশ্বর কুবেরের অলকা নামে বসতি তোমার গন্তব্যস্থল।।৭।।

উজ্জীবনী ঃ সন্তপ্তানাং—সম্যকরূপে তপ্ত—ব্যথিতগণের, যক্ষ নিদাঘ ও বিরহ—উভয়ের দ্বারাই সন্তপ্ত, ধনপতি—ধনসম্পদ বা ঐশ্বর্যের অধিপতি কুবের—"কুবেরং ধনদং খর্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েদ্ যক্ষগুহ্যক-সেবিতম্।।" (কুবেরের ধ্যানমন্ত্র)। অলকা—অলকা নামক কুবেরপুরী। 'বৃহৎসংহিতা'য় বরাহমিহির উল্লেখ করেছেন, 'অলক' এক জাতীয় মানুষ, তা থেকে স্ত্রীলিঙ্গে অলকা হতে পারে। আবার অলক—চূর্ণ কুন্তল, তা থেকে এরূপ কুন্তলের অধিকারিণী নায়িকাদের বাসস্থল অলকা—এমন অর্থও করা যায়। হর্ম্য—উচ্চ অট্টালিকা, মূল অর্থ ছিল ঘর্ম্য—ঘর্মায় ইদম্ ঘর্ম্যম্ অর্থাৎ গরম ঘর, পরে অর্থ পরিবর্তনে হল ঘর্ম্য (ঘাম) দূরীকরণের আশ্রয় অর্থাৎ আরামগৃহ। ঘর্ম্য > হর্ম্য (গ-ব্যঞ্জনলোপ ও হ-কারীভবন) √হৃ নিষ্পন্ন এই শব্দটির অর্থ কেউ কেউ করেছেন 'হরতি মনঃ ইতি হর্ম্যম্'—যা মন হরণ করে তাই হর্ম্য—অর্থাৎ সুন্দর বহুতল অট্টালিকা। মল্লিনাথ হর্ম্য-এর অর্থ করেছেন 'ধনিক ভবনানি'—ধনীদের (মনোহর) ভবনসমূহ। যক্ষেশ্বরাণং—যক্ষেশ্বর কুবেরের—গৌরবে বহুবচন।

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদগৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়দাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ।।৮।।

অন্বয় ঃ উদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ (সত্যঃ) পবনপদবীম্ আরূঢ়ং ত্বাং প্রেক্ষিষ্যন্তে। ত্বয়ি সন্নদ্ধে (সতি) বিরহবিধুরাং জায়াং কঃ উপেক্ষেত? অন্যঃ অপি জনঃ যঃ অহমিব পরাধীনবৃত্তিঃ ন স্যাৎ?

শব্দার্থ ঃ উদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ—উদ্‌গৃহীত—উপরে গ্রহণ করেছে অর্থাৎ তুলে ধরেছে, অলকান্তাঃ—অলক—অন্তাঃ—অলক বা চূর্ণকুন্তলের প্রান্ত এমন যে সকল রমণী, পথিকবনিতাঃ—দেশান্তরগামী পান্থদের স্ত্রীগণ (প্রোষিতভর্তৃকা), প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ—প্রত্যয়াৎ দৃঢ়বিশ্বাসে, আশ্বসত্যঃ—আশায় বুক বেঁধে, আশ্বস্ত হয়ে, (সত্যঃ—হয়ে) পবনপদবীম্—পবনপথে, বায়ুমার্গে অথবা আকাশে, আরূঢ়ং ত্বাং—আরূঢ় (আরোহণকারী) তোমাকে, প্রেক্ষিষ্যন্তে—দেখবে। ত্বয়ি সন্নদ্ধে (সতি)—তুমি আকাশে ঘনীভূত (উদিত) হলে, বিরহবিধুরাং জায়াং—বিরহবিধুরা জায়াকে, কঃ উপেক্ষেত—কে উপেক্ষা করবে? অন্য অপি যঃ জনঃ—অন্য কোনো ব্যক্তি, অহমিব পরাধীনবৃত্তি—আমার মতো জীবিকার জন্য পরাধীন, ন স্যাৎ—না হয়।

অন্বয়ার্থ ঃ অলকগুচ্ছের প্রান্তভাগ উপরে তুলে প্রোষিতভর্তৃকা রমণীরা প্রত্যাশায় বুক বেঁধে (আশ্বস্ত হয়ে) আকাশপথে আরূঢ় তোমাকে দেখবে। তুমি আকাশে উদিত হলে বিরহবিধুরা জায়াকে কে উপেক্ষা করবে, যদি না সে আমার মতো জীবিকার জন্য পরাধীন হয়?।।৮।।

উজ্জীবনী ঃ পবন-পদবী—পবনের পদবী বা পথ। পথ, মার্গ প্রভৃতি অর্থে পদবী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদের আমল থেকেই প্রচলিত—'পদবীঃ কবীনাম্' (ঋগ্বেদ ৩.৫.১)—কবিদের বিচরণের পথ। অর্থ পরিবর্তনে বর্তমানে পদবী—অধিকার, পদ, দশা, উপাধি (Title) প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত। পথ অর্থে শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত। অলক—চূর্ণকুন্তল, চিকুর—'কুটিলঃ কুন্তলঃ চূর্ণকুন্তলঃ' (অমরকোষ)। অলক—মুখশোভাঃ বর্ধক, তাই ভরতমুনি অর্থ করেছেন—'অলতি ভূষয়তি মুখম্ ইত্যলকম্।' শব্দটি কালিদাসের মতো রবীন্দ্রনাথেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'অলকে কুসুম না দিয়ো,' 'অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী/কথা কইত শৌরসেনী.....', অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে' প্রভৃতি 'অলক' শব্দের বহুল ব্যবহার রবীন্দ্র সাহিত্যে সুলভ। পথিক বনিতা—বনিতা—স্ত্রী < √বন্—কামনা করা। 'পন্থানঃ গচ্ছন্তি তে পথিকাঃ'—পথে চলেছে এমন পুরুষ, ভ্রমণশীল (প্রবাসী) পান্থ, তাদের স্ত্রী অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকা রমণিগণ। আশ্বসত্যঃ—বিশ্বসিতাঃ—বিশ্বাস হেতু আশ্বস্তা। সন্নদ্ধ—ব্যাপৃত, উদিত। পরাধীনবৃত্তি—মল্লিনাথ অর্থ করেছেন, 'পরায়ত্তজীবনকঃ' অর্থাৎ বৃত্তি বা জীবিকার জন্য যে পরায়ত্ত বা অপরের অধীন। বিধুরা—বিশিষ্ট ধুর (ভার, দুঃখ, ক্লেশ) যাদের তারা অর্থাৎ বিরহক্লিষ্টা, চঞ্চলা নায়িকা, বধূ প্রভৃতি।

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ।।৯।।

অন্বয় ঃ অনুকূলঃ পবনঃ ত্বাং মন্দং মন্দং যথা নূদতি, অয়ং সগন্ধঃ চাতকঃ চ তে বামঃ মধুরং নদতি, গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ খে আবদ্ধমালাঃ বলাকাঃ নয়ন সুভগং ভবন্তং নূনং সেবিষ্যন্তে।

শব্দার্থ ঃ অনুকূলঃ পবনঃ—অনুকূল বাতাস, ত্বাং—তোমাকে, মন্দং মন্দং—শনৈঃ শনৈঃ—ধীরে ধীরে, যথা—যেমন, নুদতি—ঠেলে নিয়ে যাবে, অয়ং—এই, সগন্ধঃ চাতকঃ—সগর্ব (গর্বিত) অথবা সুরভিত চাতকও (তেমনি), তে বামঃ—তোমার বাম ভাগে, মধুরং—মধুর স্বরে, নদতি—গান করবে (ডাকবে), গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ—গর্ভাধান-কালের পরিচয়ের জন্য, খে—আকাশে (খ—আকাশ), আবদ্ধ মালাঃ—মালার মতো রচিতশ্রেণী, বলাকাঃ—বকপঙ্‌ক্তি, হংসবলাকাশ্রেণী, নয়নসুভগং—নয়নশোভন, ভবন্তং—তোমাকে, নূনং—অবশ্যই, সেবিষ্যন্তে—সেবা করবে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) অনুকূল বাতাস তোমাকে যেমন ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে যাবে, এই সগর্ব (সুরভিত) চাতক ও (তেমনি) তোমার বামভাগে সুমধুর কূজন করবে (ডাকবে)। গর্ভাধানকালের পরিচয়ের জন্য (অর্থাৎ গর্ভধান ঋতু সমাগত—এটি বুঝিয়ে দেবার জন্য) আকাশে আবদ্ধমালা বকপঙ্‌ক্তি (হংস—বলাকাশ্রেণী) নয়নশোভন তোমাকে অবশ্যই সেবা করবে।।৯।।

উজ্জীবনী ঃ অনুকূল পবন—যক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বাতাস। মেঘ বায়ুবাহনের উপর ভর করে উড়ে যাবে উত্তরাপথে অলকার দিকে। তাকে সাহায্য করবে পবন, তাই অনুকূল পবন। অনুকূল পবন—শুভলক্ষণ সূচক। মন্দং মন্দং—অব্যয়; অর্থ ধীরে ধীরে, মৃদুভাবে। বাংলায় মৃদুমন্দ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়—"অতিশীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা। সখী বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা।।" (বৈষ্ণব পদাবলী) নুদতি—√নুদ—প্রেরণ করা, নিয়ে যাওয়া, রাখা, উদ্দীপিত করা প্রভৃতি। নদতি—√নদ্—কৃত্রিম শব্দ করা, কূজন করা, গান করা প্রভৃতি। অনুকূল বায়ু, পক্ষীর কূজন, বলাকাশ্রেণী প্রভৃতি শুভ লক্ষণ—'অনুকূলমারুতচাতকশব্দিতবলাকাদর্শনানাং শুভসূচকত্বং শকুনশাস্ত্রে দৃষ্টম্।'—বলেছেন মল্লিনাথ। সগন্ধঃ—গন্ধযুক্ত বা গন্ধবহ, মল্লিনাথ অর্থ করেছেন গর্বিত। সগন্ধ পদটিকে চাতকের বিশেষণ ধরে নিয়ে মল্লিনাথ থেকে একালের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাজশেখর বসু, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদগ্ধ মেঘদুত-ব্যাখ্যাতাগণ সগন্ধঃ চাতকঃ-এর অর্থ করেছেন গর্বিত চাতক। আবার কেউ কেউ সগন্ধ অর্থে 'সম্বন্ধী' (Brother-in-law) পদের ব্যবহার সমীচীন মনে করেছেন। তাঁদের মতে মেঘের সঙ্গে চাতকের ভগিনীপতি-শ্যালক সম্পর্ক। কিন্তু মেঘদূত কাব্যের অনুষঙ্গে কি 'গর্বিত,' কি 'সম্বন্ধী' কোনো পদেরই অর্থসঙ্গতি নেই। মনে হয়, এগুলি কষ্টকল্পনা। চাতকের নিজস্ব সৌরভ থাকতে পারে। সগন্ধ অর্থাৎ গন্ধবহ সুরভিত চাতক অর্থও দূষণীয় নয়। এছাড়া সগন্ধ পদটি একটু দূরান্বয়ী হলেও পবনের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা যায়। তাতে অর্থ হয় অনুকূল সুগন্ধ পবন। এতে অর্থসঙ্গতি রক্ষা হয়, কষ্টকল্পনারও প্রয়োজন থাকে না।

তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ।।১০।।

অন্বয় ঃ অবিহতগতিঃ ত্বং দিবসগণনাতৎপরাং (অতঃ) অব্যাপন্নাং এক পত্নীং তাং ভ্রাতৃজায়াং চ অবশ্যং দ্রক্ষ্যসি। (যতঃ) আশাবন্ধঃ হি কুসুমসদৃশং বিপ্রয়োগে সদ্যঃপাতি অঙ্গনানাং প্রণয়িহৃদয়ং প্রায়শঃ রুণদ্ধি ।

শব্দার্থ ঃ অবিহতগতিঃ ত্বং—অব্যাহতগতি, অপ্রতিহতগতি তুমি, দিবসগণনাতৎপরাং—দিন গুণতে তৎপর (অতএব), অব্যাপন্না—অবিপন্না, অমৃতা, জীবিতা, এক পত্নীং—একমাত্র পতি যার অর্থাৎ পতিব্রতা, তাং ভ্রাতৃজায়াং চ—সেই (তোমার) ভ্রাতৃজায়াকেও (যক্ষবধূকে), অবশ্যং—অবশ্যই, দ্রক্ষ্যসি—দেখবে। (যতঃ—কেননা) আশাবন্ধঃ—আশারূপ বন্ধন বা আশারূপ বৃন্ত, কুসুমসদৃশং—ফুলের মতো, বিপ্রয়োগে—বিচ্ছেদে বা বিরহে, সদ্যঃপাতি—সদ্যভগ্ন অর্থাৎ ভঙ্গুর, অঙ্গনানাং-অঙ্গনাগণের, প্রণয়িহৃদয়ং—প্রণয়ে ভরা হৃদয়কে, প্রায়শঃ—বহুলভাবে, গভীরভাগে, প্রায়শঃ, রুণদ্ধি—রক্ষা করে, ধরে থাকে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) অব্যাহত গতি—দুর্নিবার তুমি, দিন গুণতে তৎপর (অতএব) অবিপন্না—অমৃতা (জীবিতা), পতিব্রতা, (তোমার) সেই ভ্রাতৃজায়াকেও অবশ্যই দেখতে পাবে। (কেননা) আশারূপ বৃন্ত

(আশাবৃন্ত) বিচ্ছেদে সদভগ্ন ফুলের মতো প্রণয়ে ভরা (কোমল) হৃদয়কে প্রায়শঃ (গভীরভাবে, বহুলভাবে) ধরে থাকে (রক্ষা করে থাকে)।।১০।।

উজ্জীবনী ঃ দিবসগণনাতৎপরা—দিন গুণতে তৎপর, প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা। অমরকোষ 'তৎপরা' শব্দের অর্থ করেছেন আসক্ত—'তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ।' প্রিয়াবিরহিণী নায়িকা প্রবাসী নায়কের (স্বামীর) গৃহপ্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি দিনের হিসেব রাখত। এমন এক নায়িকার বর্ণনা পাই কবি সাতবাহন হাল রচিত 'গাহাসত্তসঈ'র (গাথাসপ্তশতী) প্রাকৃত শ্লোকে। এখানে নায়িকা প্রিয়সমাগমপ্রত্যাশায় 'আজই গেল, আজই গেল, আজই গেল—এইরূপ গণনা করে দিবসের প্রথমার্ধেই গৃহকুড্য বা ঘরের দেওয়ালটিকে রেখা দ্বারা চিত্র-বিচিত্র করেছে—"অজ্জং গওত্তি অজ্জং গওত্তি অজ্জং গত্তত্তি গণরীত্র। পঢ়মে বি অ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও।।" উত্তরমেঘে কালিদাস অনুরূপ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। সেখানে অবশ্য নায়িকা দেহলীতে রাখা ফুলগুলি ভূমিতে সাজিয়ে বিরহ দিবস থেকে আরম্ভ করে অবশিষ্ট মাসগুলি গণনা করেছে—'বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।' (উত্তরমেঘ ৯৩) বন্ধঃ—বৃন্ত বা বোঁটা(<সং বন্ধ, বৃন্ত > বন্ট > বোঁটা); আবার 'বধ্যতে অনেন ইতি বন্ধঃ বন্ধনম্ বৃন্তম্'—বেঁধে রাখে বা ধরে রাখে বলেই বন্ধ-বন্ধন, বৃন্ত। আশার বন্ধন সদুঃসহ বিরহ-যাতনাও লাঘব করে। মানব জীবনে আশার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা সবদেশের সাহিত্যেই প্রতিফলিত। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।' (মধুসূদন) অথবা 'ধন্য আশা কুহকিনী' (আশা—নবীনচন্দ্র সেন) প্রভৃতি বাঙালি কবির কাব্যে আশার ভূমিকা যেমন, তেমনি কবি বিদ্যাপতির পদাবলীতেও বিপ্রকৃষ্টা নায়িকার উজ্জীবন বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। নায়িকা প্রিয়বিরহে যখন বলেন—"এখন তখন করি দিবস গমাওল/দিবস দিবস করি মাসা।/মাস মাস করি বরষ গমাওল/ছোড়লুঁ জীবনক আশা।।" তখন কবি তাকে আশ্বস্ত করেছেন—"ভণই বিদ্যাপতি সোই কলাবতি/জীবনবন্ধন আশ-পাশ।" John Donne-এর 'Love Song' কবিতাতে প্রিয়বিরহে পতিব্রতা নায়িকা একই প্রত্যাশার বাণী উচ্চারণ করেছে—

"If our two loves be one, or thou and,
Loves so alike that none do slaken,
None can die."

আশা অর্থে 'আশা দিগতিতৃষ্ণয়োঃ' বলেছেন যাদব। ভ্রাতৃজায়া—বলার উদ্দেশ্য গুরুসম্বন্ধী; কামরূপ মেঘ যাতে সুন্দরী যক্ষপত্নীকে দেখে প্রলুব্ধ না হয় তারজন্যই এই সতর্কতা। যক্ষ যে সেয়ানা পাগল তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সদ্যঃপাতি—সদ্যঃ—সবেমাত্র, পাতি—পতনশীল, ভ্রংশনশীল, সমাসবদ্ধ হয়ে সদ্যঃপাতি, অর্থ সদ্য-প্রস্ফুটিত (এই বুঝি ঝরে পড়বে এমন) ফুল। প্রণয়িহৃদয়ং—প্রণয়—প্রেম, স্নেহ, সৌহৃদ্য, বিশ্বাস প্রভৃতি। প্রণয় আছে যার যে প্রণয়ী, প্রণয়ে ভরা হৃদয়—প্রণয়িহৃদয়, (সমাসবদ্ধ) , কুসুমসদৃশং—ফুলের মতো (পবিত্র, কোমল, সুকুমার), অঙ্গনা—'সুন্দরাঙ্গী রমণী। অঙ্গনা শব্দে অঙ্গ সৌন্দর্যের দ্যোতনা এল।

মেঘদূতে (পূর্বমেঘ) ব্যবহৃত সুভাষিত

মহাকবি কলিদাস মেঘদূতকাব্যে (পূর্বমেঘ) যে সকল শাশ্বতবাণী বা সুভাষিত ব্যবহার করেছেন সেগুলি ভাবের মাধুর্যে ও অনুভূতির গভীরতায় অনুপম। এক দিক থেকে তাঁর ব্যবহৃত সুভাষিতগুলি অভূতপূর্ব, অনাস্বাদিত ও মৌলিক। অন্য দিক থেকে, সেগুলি মূল বক্তব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে গ্রথিত এবং নিবিড় জীবনরসে পূর্ণ। অনেকখানি ভাবকে সংহত, স্ফটিকঘন ভাষায় প্রকাশের উজ্জ্বল নিদর্শনও সেগুলি। ঐ সকল বহুমূল্য প্রৌঢ়োক্তির মধ্যে বাছাই করা কয়েকটি নমুনাস্বরূপ এখানে উল্লিখিত হল।—

১। 'মেঘালোকে ভবতি সখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ'—মেঘ দেখলে সুখী মানুষের মনও উতলা আনমনা হয়। [পূর্বমেঘ ৩]

২। 'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'—চেতন-অচেতনের বিচারে কামার্তগণ স্বভাবতই কৃপার পাত্র হয়ে থাকে [পূর্বমেঘ ৫]

৩। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'।—অধমের কাছে প্রার্থনা করে সফল হওয়ার চেয়েও বরং অধিকগুণশালীর কাছে প্রার্থনা করে নিষ্ফল হওয়াও শ্রেয়। [পূর্বমেঘ ৬]

৪। 'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং

সদ্যঃপাতি প্রণয়ীহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ।—বিরহে বা বিচ্ছেদে আশারূপ বৃন্ত সদ্যভগ্ন ফুলের মতো প্রণয়ে ভরা (কোমল) হৃদয়কে প্রায়শই রক্ষা করে থাকে। [পূর্বমেঘ ১০]

৫। 'শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তমৈব প্রার্থনাচাটুকারঃ।'—শিপ্রা নদীর বাতাস চাটুকারের প্রার্থনার মতো প্রিয়। [পূর্বমেঘ ৩২]

৬। 'মন্দায়ন্তে ন খলু সহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ'—যারা প্রয়োজনীয় বা অভিপ্রেত কাজটি করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা কখনো মন্দগতি বা ঢিলে হয় না। [পূর্বমেঘ ৩৯]

৭। 'আপন্নার্তিপ্রশমনফলা সম্পদোহ্যুত্তমানাম্'—বিপন্নদের দুঃখ লাঘব করাই হল মহৎ (উত্তম) ব্যক্তির সম্পদ। [পূর্বমেঘ ৫৪]

৮। 'কে বা ন স্যু পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ'—নিষ্ফল কার্যারম্ভে (অ-কাজের কাজে) যাদের উৎসাহ তারা চিরকাল পরাজিত বা ব্যর্থই হয়ে থাকে।

৬.১.৪. ৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (বর্ণানুক্রমিক)

১। অনুবাদে মেঘদূতঃ সার্ধশতবর্ষ (প্রথম খণ্ড)—ড. নরেশচন্দ্র জানা

২। অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৩। অমরুশতক (১৩৭২)—শ্রীবামাপদ বসু-অনূদিত

৪। অলঙ্কার-চন্দ্রিকা (২য় সং, ভাদ্র-১৩৬৩)—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

৫। আরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব (২য় সং ১৩৬৯)—ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৬। আনন্দবর্ধন-প্রণীত ধ্বন্যালোক (বঙ্গানুবাদ, ১ম সং, ১৩৬৪)—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

৭। উর্দু প্রেমের কবিতা (১ম সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৮। উপমা কালিদাস্য (১ম সং)—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৯। ঋগ্বেদসংহিতা (বঙ্গানুবাদ ১৯৬৩)—রমেশচন্দ্র দত্ত

১০। কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ (৪র্থ সং, ১৩৭২)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১১। কাব্য-জিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী ১৯৬১)—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

১২। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র), বসুমতী (১০ম সং-১৩৬০)—রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১৩। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ (১ম সং, ১৯৬৫)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৪। কাব্যালোক (৩য় সং, ১৩৭৩)—ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

১৫। কাব্যকৌতুক (১লা আশ্বিন, ১৩৬৩)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৬। কালিদাসের কাব্যে ফুল (১ম সং, বুকল্যান্ড, কলিকাতা)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭। ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী (১ম সং, ১৯৬২)—ড. দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

১৯। গাহা সওসঈ (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২০। পারস্য সাহিত্য-পরিক্রমা (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২১। পুরাণ প্রবেশ (২য় সং, ১৩৮৫)—গিরীন্দ্রশেখর বসু

২২। প্রাচীন সাহিত্য (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৬২)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম ও ২য় খণ্ড,১৩৭১)—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী।

২৪। বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫। বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (১ম সং, ১৩৫৯)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন

২৭। মেঘদূত পরিচয় (১ম সং, ১৩৭৪)—শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২৮। মেঘদূত জিজ্ঞাসা (২য় সং, ২০০৫)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২৯। রবিদীপিতা (৩য় মুদ্রণ)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৩০। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (২য় সং, ২০০০)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৩১। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (২য় খণ্ড)—নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯

৩২। Aristotle on the Art of Poetry (Oxford Univ. Press, 1962)–Trs. by I. Bywater.

৩৩। An Introduction to Modern Knowledge–Abercrombie

৩৪। History of Indian Literature (Vol 1-3, 1963)–M. Winternitz

৩৫। Kalidasa : A Critical Study (Bharatiya Vidya Prakashan, 1977)–A.D. Sing

৩৬। The Meghaduta–(1st Ed. Sahitya Akademi, New Delhi, 1957)–Dr. S. K. De

৬.১.৪.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মেঘদূত কাব্যের ভাব-উৎস সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। আধুনিক কাব্যের বিচারে 'মেঘদূত'কে গীতিকাব্য বলা যায় কি? তোমার মতামত আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করো।

৩। মেঘদূত কাব্য (পূর্বমেঘ) অবলম্বনে কালিদাসের নিসর্গচেতনার পরিচয় দাও।

৪। মেঘদূত কাব্যের 'পূর্বমেঘ' অবলম্বনে চিত্রসৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৫। রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মেঘের যাত্রাপথের সৌন্দর্য-শোভার বর্ণনায় কবির কুশলতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬। মেঘদূত কাব্যের উপমা সৃষ্টিতে কবির অন্যনতা কোথায় তা পূর্বমেঘ থেকে কয়েকটি উপমা চয়ন ও তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

৭। 'মেঘদূত' কাব্যের নদীগুলি কেবল প্রকৃতির সম্পদ মাত্র নয়, বিরহিণী নায়িকা'।—প্রকৃতি-নদী ও নারী এই কাব্যে কীভাবে অভিন্নতা লাভ করেছে তা পূর্বমেঘ অবলম্বনে উপস্থাপন করো।

৮। মেঘদূত (পূর্বমেঘ) কাব্যে ব্যবহৃত সুভাষিতাবলীর কাব্যসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করো।

৯। 'মেঘদূত সম্ভোগের উজ্জ্বল চিত্রাবলী—সমালোচকের এই মন্তব্য মেঘদূত কাব্যের 'পূর্বমেঘ' সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কিনা তা আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করো।

১০। 'মেঘদূত' (পূর্বমেঘ) অবলম্বনে কালিদাসের জীবনদৃষ্টির পরিচয় দাও।

১১। উল্লেখযোগ্য শ্লোকগুলি থেকে বিষয়ভিত্তিক (Textual) প্রশ্ন থাকবে। দৃষ্টান্ত যেমন—'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।' —এই বাক্যের বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? পঙ্‌ক্তিটির ভাব-তাৎপর্য বিশদ করো।

❖ অনুরূপভাবে শ্লোক ধরে ধরে প্রশ্ন থাকবে।

———

পর্যায় গ্রন্থ-২

মেঘদূত (উত্তরমেঘ)

একক - ৫

বিরহভাবনা

বিন্যাসক্রম ঃ

৬.২.৫.১ ঃ বিষয়সূচী

৬.২.৫.২ ঃ মেঘদূত কাব্যের বিরহ-ভাবনা

৬.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৫.১ঃ বিষয়সূচী

বিষয়	শ্লোক	বিষয়	শ্লোক
অলকা			
প্রাসাদ	১	মদনের ষষ্ঠবাণ	১২
অলকাবধূ	২	কল্পবৃক্ষ	১৩
অলকার সৌন্দর্য	৩	**যক্ষগৃহ**	
যক্ষ	৪-৫	তোরণ ও মন্দারবৃক্ষ	১৪
যক্ষকন্যা	৬	বাপী	১৫
পানোৎসব	৭	ক্রীড়াশৈল	১৬
ক্ষুদ্র অভ্রবৃন্দ	৮	মাধবীকুঞ্জ	১৭
যক্ষদম্পতি	৯	ময়ূর	১৮
বৈভ্রাজ উপবন	১০	শঙ্খপদ্মচিহ্ন	১৯
অভিসারপথ	১১	মেঘের দৃষ্টিসঞ্চার	২০
		যক্ষবধূ	২১-৩৭
		মেঘসন্দেশ	৩৮-৫৪

৬.২.৫.২ঃ মেঘদূত কাব্যের বিরহ-ভাবনা

প্রেমের দুটি প্রান্ত—মিলন ও বিরহ অথবা বিরহ ও মিলন। বিচ্ছেদের অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র পেরিয়ে মিলনের মঙ্গলমাধুর্য দয়িত-দয়িতার জীবনকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে। এই জন্যই বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতো' অর্থাৎ বিরহ ছাড়া মিলন পূর্ণতা পায় না। বিরহ-মিলনের মঙ্গলগীতি যুগে যুগে কবিদের সারস্বত অভিনিবেশের বিষয় হয়েছে, আনন্দ দিয়েছে অগণিত সাহিত্যরসলিপ্সুদের। কালিদাসের মেঘদূত এমনি একটি মহৎ কাব্য যাতে বিরহের সকরুণ আর্তি ও মিলনের মাধুর্য একাকার হয়ে মিশ্ররসে পূর্ণ এক অনাস্বাদিত ভাবরসলোককে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তুলেছে।

মেঘদূত কাব্য বিরহী-প্রেমিক যক্ষের বেদনামেদুর স্মৃতিচারণা। এই স্মৃতিচারণাসূত্রে তার 'রোদনভরা বসন্তের' বা বসন্তবিলাপের পরিচয়ে ঋদ্ধ ও ভাস্বর মেঘদূত কাব্যের দুই পর্ব-পূর্ব ও উত্তরমেঘ। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে 'Nostalgia', ইংরেজ কবি টেনিসনের 'In Memorium' তার উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু তাঁর রচনার প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল জগতের প্রথম নস্টালজিক কাব্য মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রয়োজনবোধে মৎপ্রণীত 'মেঘদূত-জিজ্ঞাসা', গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করছি।—

"মেঘদূত কাব্যখানা যক্ষের স্মৃতিসুধারসে আর্দ্র অশ্রুর নির্ঝর। সুখের স্মৃতির সঙ্গে বেদনার ভাবস্পর্শে তার সুদূরপ্রসারী কল্পনা বহুগুণিত হয়ে বিরহিণী বধূর করুণা মাখানো একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য উপহার দিয়েছে—

"আলিঙ্ক্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ।
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কলি ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।" [উ.মে. ৪৬]

[(সৌগন্ধ্যসুরভিত) হিমাদ্রির যে বাতাস দক্ষিণ দিকে বইছে, ওগো গুণবতি,

তোমার অঙ্গ তাদের দ্বারা পূর্বস্পৃষ্ট, এই ভেবে আমি তাদের (বায়ুদলকে) মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করি।] বিরহী প্রেমিকের চোখের জলে যে নির্ঝর বেগবান তা নিখিল নিসর্গলোক ব্যাপ্ত করে উপলব্ধির প্রশান্ত সাগরে বিলীন হয়েছে। সেখানে বিরহ-মিলনের অনন্ত সুখার্তি বাঙ্ময় হয়েছে সত্য, কিন্তু পরবর্তী কালের পদাবলী সাহিত্যের মতো মিলনে বিপ্রলম্ভ বা বিচ্ছেদের আর্তি (প্রেমবৈচিত্র্য) নেই। সমগ্র পূর্বমেঘ জুড়ে বিরহ-মিলনের অন্ত্যহীন বৈচিত্র্য কামনার বৃন্তে সৌন্দর্যের ফুল হয়ে ফুটেছে। পূর্বমেঘ সেই বাসনারক্তিম বিরহার্ত 'বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ' (রবীন্দ্রনাথ) যেখানে যক্ষদূত মেঘের প্রয়াণের পথরেখায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বর্ণগন্ধময় উপস্থিতি নিসর্গলোকে প্রতিফলিত হয়ে একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে তুলেছে। এই সৌন্দর্য-সম্ভোগের পর্যবসান প্রেমানুভূতির সুনির্মল রসলোকে।" ['মেঘদূত-জিজ্ঞাসা' (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

আসলে মেঘদূত কাব্যের মূল আশ্রয় সুনির্মল ও সুনিবিড় প্রেমানুভূতি। এই প্রেমের গৌরবময় বোধই সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় প্রেমিক হৃদয়কে সংবেদনশীল মাধুর্যরসে পূর্ণ করে। সুদীর্ঘ বা ক্ষণস্থায়ী কোনো কালসীমায় একে আবদ্ধ করা চলে না। কেননা মিলনের মঙ্গল মাধুর্যই হোক বা বেদনার দীর্ণতাই হোক, ভাবটি তো চিরকালের! সেই চিরায়ত ভাবটিই কবিসৃষ্টির আন্তরিকতায় হৃদয়ের রঙে, হৃদয়ের স্পর্শে নিখিল বিশ্বের চিত্তলোকে স্থায়ী হয়। এই অকৃত্রিম, প্রাণবান, আবেগদীপ্ত প্রেমের ভাবটিই বিশ্বজয়ী। মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘ পর্যায়ে বিরহের এক অন্তলান্ত মহিমা কালজয়ী হয়েছে। এতেই মগ্ন হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়, বোধকরি স্রষ্টা কবিরও হৃদয়। যক্ষ নামধেয় অনির্দেশ্য সত্তাচেতনার আড়ালে স্পন্দিত কবিহৃদয়ের আর্তি 'বিশ্বের প্রবাসী প্রিয়জনদের চিরন্তন বিচ্ছেদার্তির' সূচক হয়ে মেঘদূতকে গীতিকাব্যে (Lyric Poetry) পরিণত করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

"মেঘদূত যক্ষের বিচ্ছেদক্রন্দন ও মিলনার্তি আসলে কবির অন্তরাত্মারই আকুল ক্রন্দন—সীমাবদ্ধ জীবন থেকে অনন্ত সৌন্দর্যলোকে মুক্তির জন্য ক্রন্দন। মেঘদূতে যক্ষের ভাবছায়ায় 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দনে' সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে নিখিল বিশ্বলোকে, জাগিয়ে তুলেছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত বিরহ-বেদনা। কাব্য-কাহিনী নয়, নিসর্গচিত্রণ নয়—সব কিছুকে ছাপিয়ে জেগে ওঠে বিরহী প্রেমিক সত্তার শাশ্বত বিরহসঙ্গীত, ইংরেজ কবি ম্যাথিউ আর্নল্ডের ভাষায় সেই 'Eternal Passion! Eternal song'. (Philomela–Mathew Arnold) বিচ্ছেদেই প্রেম ঘনীভূত হয়—এই কথাটি উত্তরমেঘে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন কালিদাস—

"স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাৎ
ইষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি।।" (উত্তরমেঘ ৫১)

তাই চিরন্তন বিরহের কাব্যরূপে মেঘদূতের ভাবমূর্তিটি আজও অম্লান হয়ে আছে। প্রেমের সেই নিবিড় অন্তঃসার অনুভব থেকেই উদার যক্ষের প্রার্থনা—'মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।' (উত্তরমেঘ ৫৪) মেঘ ও বিদ্যুতের প্রতীকে প্রেমিক যক্ষ যেন বিশ্বের বিরহী-বিরহিণীর মর্মব্যথাকেই প্রকাশ করেছে।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা,' (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

মেঘদূত কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ কাব্যখানি পাঠ করে তার মধ্যে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে মেঘদূত বিরহের কাব্য কিন্তু কেবল পার্থিব বিচ্ছেদার্তির কাব্য নয়, কেননা তার মধ্যে আভাসিত হয়েছে বিরহের বিমূর্ত ভাব-ব্যঞ্জনা। সেই ভাব-ব্যঞ্জনাকে তিনি তুলে ধরেছেন এই ভাবে—

(১) মানুষের মধ্যে দেশে দেশে বিরহ—এক দেশের মানুষের জন্য অন্যদেশের মানুষের বিরহ।

(২) কালে কালে বিরহ—এক কালের মানুষের সঙ্গে অন্য কালের মানুষের বিরহ।

(৩) মানস বিরহ—একই মানুষের অন্তরে রয়েছে যে অবিনশ্বর মানুষ—অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই অবিনশ্বর মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের মানস বিরহ।

মেঘদূত কাব্যে যক্ষের ভাবছায়ায় ব্যক্তি-কবি-আত্মার মানসাভিসার পাঠক-পাঠিকাকে এক দিব্য ভাবলোকে পৌঁছে দেয়। এই দিব্য ভাবলোকই হল মেঘদূত কথিত কৈলাসের অন্তর্গত অলকা-যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার স্বপনপুরী। সশরীরে সেখানে যাওয়া যায় না বলে কল্পনাকে দূত করে মানসাভিসারে বের হতে হয়, এ ছাড়া অন্যপথ নেই। কবিও সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—

"সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।"

একক - ৬

কাব্যের চরিত্র

বিন্যাসক্রম

৬.২.৬.১ মেঘদূত কাব্যের চরিত্র

৬.২.৬.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৬.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৬.১ মেঘদূত কাব্যের চরিত্র

মেঘদূত ভাবপ্রধান প্রেমগীতিকা। কিন্তু কেবল ভাব বা আইডিয়াকে অবলম্বন করে সেই গীতিকার সৌরভ ফোটে না। একটা স্বপ্ন-কল্পনাশ্রিত ভাবাবেগকে প্রকাশ করবার জন্য উপযুক্ত আধারের প্রয়োজন। মেঘদূত কাব্যের আধার বিরহী যক্ষ, আধেয় তার বিরহ-বেদনা -—রোদনভরা বসন্তবিলাপ। সুতরাং স্বপ্ন-কল্পনাবিলাসী যক্ষই মেঘদূত কাব্যের প্রধান চরিত্র। তার আনন্দ-বেদনা-বিধুর-মিলন-বিরহের কলোচ্ছ্বাস এই কাব্যের জীবনসঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাটা যে বিরহদীর্ণা অলকানিবাসিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সেই তার দ্বিতীয় জীবন (জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্) প্রিয়তমা যক্ষবধূ রূপ-গুণ-ঐশ্বর্যে যিনি জগতে অতুলনীয়, বিধাতার আদিসৃষ্টি (সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ)। সুতরাং মেঘদূত কাব্যের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র অনামিকা যক্ষপ্রিয়া।

মেঘদূত দূতকাব্য। সুতরাং কাব্যবাণী—যক্ষের বিরহবার্তা প্রিয়তমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য একজন উপযুক্ত, সংবেদনশীল দয়াবান ও সুজন বাহন থাকা চাই। ইন্দ্রের প্রধান সহচর (প্রকৃতি পুরুষ),

যেখানে খুশি গমনশীল (কামরূপ), বন্ধুবৎসল, দরদী পর্জন্যদেব মেঘ ছাড়া তেমন উপযুক্ত পাত্র আর কেই বা হতে পারে? যার নামের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে উদ্দিষ্ট কাব্যের অভিব্যঞ্জনা —মর্মবাণী সেই কোমলস্বভাব মেঘদূতই প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক প্রধান চরিত্র।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে মেঘদূত কাব্যে পূর্বোক্ত তিনটি চরিত্রের পাশে আরও একটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এই চরিত্রটি একটা বিমূর্ত ভাবের নান্দনিক প্রকাশস্বরূপ বিশ্ববিমোহন নিসর্গ প্রকৃতি। বস্তুত এই নিসর্গপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য - সুষমাকে বাদ দিয়ে মেঘদূত কাব্যের রসাস্বাদন বৃথা। উজ্জীবন্ত নর-নারীর মতো প্রকৃতির কবোষ্ণ নিঃশ্বাস সমগ্র মেঘদূত কাব্যকে অতুলনীয় সৌন্দর্যেও প্রাণরসে পূর্ণ করে তুলেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"নিখিল নিসর্গ প্রকৃতিও একটি বিরাট চরিত্র। শোভা - সম্পদে, ঐশ্বর্যে-ধ্যানে, ব্যক্তিত্বের মহিমায় যক্ষের বিরহ-বেদনাকে সর্বব্যাপক রূপ দান করে সহযোগী সত্তারূপে সে আমাদের হৃদয়াসন জুড়ে বসেছে। কত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়, ঐশ্বর্যদীপ্ত অভিব্যক্তি তার!" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

একক - ৭

ছন্দ - উপমা

বিন্যাসক্রম

৬.২.৭.১ মেঘদূত কাব্যের ছন্দ: মন্দাক্রান্তা ও বাংলা ছন্দ

৬.২.৭.২ মেঘদূত কাব্যের উপমা

৬.২.৭.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৭.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৭.১ মেঘদূত কাব্যের ছন্দ ঃ মন্দাক্রান্তা ও বাংলা ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যের গঠনশৈলীর অন্যতর উপাদান হল ছন্দ। কাব্য সৃষ্টিতে ছন্দোরচনায় নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে শ্রুতিমাধুর্যের বিশেষ মাত্রা। সংস্কৃত ছন্দের যাদুকর কালিদাস শ্রুতিনন্দন ছন্দোনির্মাণে অসামান্য বুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সেই অসামান্যতা প্রমূর্ত হয়েছে মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রয়োগকুশলতায়। মেঘদূত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। আদ্যন্ত একই ছন্দে রচিত কাব্য মেঘদূতের আখ্যান মন্দাক্রান্তা ছন্দের শ্রেষ্ঠত্বদ্যোতক। এই ছন্দের বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার।

ছান্দসিক গঙ্গাদাস তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ছন্দোমঞ্জরী'তে 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন— 'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ তৌ গযুগ্মকম্।' এই শ্লোকানুসারে অম্বুধি = ৪, রস = ৬, ও নগ = ৭ অর্থাৎ ৪+৬+৭=১৭ অক্ষরের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ হয় মন্দাক্রান্তা ছন্দে নিবদ্ধ কবিতার এক-একটি চরণপংক্তি। আবার হ্রস্বস্বর বা লঘুস্বর এবং দীর্ঘস্বর বা গুরুস্বরের তারতম্যে মন্দাক্রান্তার পংক্তিবিন্যাস কয়েকটি সাংকেতিক অক্ষর সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই অক্ষর সংখ্যাগুলি যথাক্রমে—মভন ত ত গগ। সংস্কৃতে গুরুস্বরের সাংকেতিক চিহ্ন—এবং লঘুস্বরের সাংকেতিক চিহ্ন ◡ । এই সূত্রে—

ম =——— (অর্থাৎ তিনটিই গুরুস্বর)

ভ =– ◡ ◡ (অর্থাৎ প্রথমটি গুরুস্বর, পরের দুটি লঘুস্বর)

ন = ◡ ◡ ◡ (অর্থাৎ তিনটিই লঘু বা হ্রস্বস্বর)

ত =–— ◡ (অর্থাৎ প্রথম দুটি গুরু ও পরেরটি লঘুস্বর)

ত =–— ◡ (অর্থাৎ প্রথম দুটি গুরু ও পরেরটি লঘুস্বর)

গ =– (অর্থাৎ একটিই গুরুস্বর)

গ =– (অর্থাৎ একটিই গুরুস্বর)

সূত্রানুসারে মন্দাক্রান্তার প্রতি চরণে গণের বা পর্বের বিন্যাস যথাক্রমে প্রথমে ৪ অক্ষরের পর্ব, মধ্যে ৬ অক্ষরের এবং শেষে ৭ অক্ষরের পর্ব; সর্বমোট ৪+৬+৭=১৭ অক্ষরের সমন্বয়ে চরণপংক্তির সম্পূর্ণতা বিধান। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেঘদূতের প্রথম স্তবকের ৪টি পংক্তির ছন্দোবিন্যাস দেখানো হল। অনুরূপভাবে পুরো মেঘদূত কাব্যের চরণপংক্তির ছন্দোবিন্যাস নির্ণয় করা যায়।—

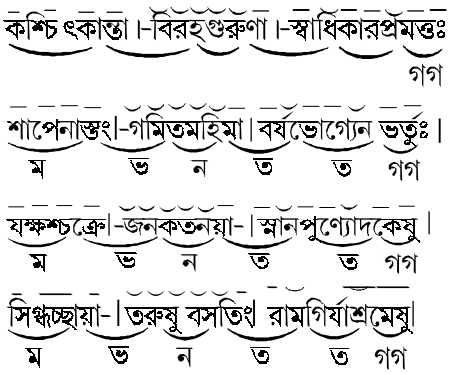

‘পদ্যং অক্ষরসংখ্যাতং—এই সূত্রানুসারে সংস্কৃতের জাতিচ্ছন্দ ও মাত্রাছন্দ হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরানুযায়ী অক্ষর সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে মন্দাক্রান্তা-ছন্দোনিবদ্ধ প্রতি চরণপংক্তির মধ্যে প্রথম গণ বা পর্বযতির চারটি অক্ষর গুরু (—), দ্বিতীয়ের প্রথম পঞ্চাক্ষর লঘু (⏑), একাক্ষর গুরু এবং তৃতীয়ের বা শেষের প্রথম অক্ষরটি গুরু, দ্বিতীয়টি লঘু, তৃতীয়-চতুর্থ গুরু, পঞ্চমটি লঘু এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম দুটি গুরু অক্ষর। “এইভাবে সতেরোটি অক্ষরের ঠাস বুনুনিতে পূর্ণমন্দাক্রান্তার প্রতিটি চরণ-বিন্যাস। হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের স্পষ্ট-উদাত্ত-বিশুদ্ধ গমকে উচ্চারণের উপর নির্ভর করে এই ছন্দের মাধুর্যমহিমা।” (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিসুষমা ও রসমাধুর্য বাঙালি কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কালিদাস অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিমনীষী মন্দাক্রান্তার অনুসরণে বাংলা কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সফলতার মাত্রা নগণ্য। মন্দাক্রান্তার নকল করে বাংলায় মেঘদূতের কাব্যানুবাদ প্রায় অসম্ভব ধরে নিয়ে কবিগুরু সে পথ পরিহার করেছিলেন এবং মুক্তচ্ছন্দে তাঁর মেঘদূতাশ্রয়ী কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। মেঘদূতের কাব্যানুবাদে মন্দাক্রান্তার প্রয়োগ খানিকটা সফল হয়েও পুরোপুরি সফলতা অর্জন সহজলভ্য হবে না বুঝতে পেরে সত্যেন্দ্রনাথও সে পথ অচিরেই পরিত্যাগ করেছিলেন। আর বুদ্ধদেব বসু মন্দাক্রান্তার পর্বচালটিকে গ্রহণ করেই চিরাচরিত বাংলা ছন্দে মেঘদূতের অনুবাদে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সমকালে তো বটেই, সাম্প্রতিক কালেও কোনো বঙ্গীয় কবি মন্দাক্রান্তা ছন্দের হুবহু অনুসরণে বাংলায় কবিতা রচনা করে সাফল্য অর্জন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। নিয়ম-শৃঙ্খলার দুরূহতাই বোধ করি এই ছন্দানুশীলনের মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজও তাই।

৬.২.৭.২ মেঘদূত কাব্যের উপমা

মহাকবি কালিদাসের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উপমা সৃষ্টিতে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা। ‘উপমা কালিদাসস্য’—এই শিষ্ট বাক্যটি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কালিদাসের অনন্যতার সূচক। উপমা অলঙ্কার

সৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য অন্যান্য কবিদের তুলনায় তাঁকে যেমন বিশিষ্ট করেছে, তেমনি উজ্জ্বল করেছে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তিকে। বৈদর্ভীরীতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের স্বর্ণোজ্জ্বল উপমাগুলি ভাবের গভীরতা, বক্তব্যের প্রসারতা প্রসাদ মাধুর্য ও ব্যঞ্জনায় পাঠক-পাঠিকার অন্তর স্পর্শ করে। উপমা কাব্যসুন্দরীর বরাঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। যে-কোনো উৎকৃষ্ট কাব্যের বিশেষগুণ এই অলঙ্কার।

অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে 'উপমা' শব্দের অর্থ তুলনা। স্বভাবধর্মে বিজাতীয় অথচ গুণ, অবস্থা ও ক্রিয়ার দিক থেকে সূক্ষ্ম মিল আছে এমন ব্যক্তি, বস্তু ও অবস্থার সঙ্গে তুলনা। উপমা অর্থালঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত। তুলনাশ্রয়ী এমন অর্থালঙ্কারও অনেকগুলি—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি, ভ্রান্তিমান, সমাসোক্তি, সন্দেহ প্রভৃতি। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল উপমা ছাড়াও উল্লিখিত অলঙ্কারগুলিও উপমা প্রসঙ্গে আলোচ্য। উপমা অলঙ্কার ছাড়াও অন্যান্য অলঙ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কালিদাস রাজাধিরাজ। অবশ্য তাঁর এই অভিধা কেবলমাত্র সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ।

উপমা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। কালিদাস ব্যবহৃত অত্যুজ্জ্বল-সুন্দর উপমাগুলির "বেশির ভাগই সংযোজিত হয়েছে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলমে। সর্বোপরি তার উপমাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গির অনিবার্য প্রকাশ, পৃথক কোনো অলঙ্কার নয়। প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ সেই উপমাগুলি রসবোধে সমুজ্জ্বল।" (মেঘদূত জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বমেঘ-এর তৃতীয় শ্লোকটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি বলেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।

কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিংপুনর্দূরসংস্থে।।" (পূ.মে. ৩)

শ্লোকটির বাচ্যার্থ সাধারণ কিন্তু তার ব্যঞ্জনা সুগভীর। কবি যক্ষের বিরহবেদনার গভীরতাকে বোঝাতে গিয়ে বললেন—মেঘ সন্দর্শনে সাধারণ সুখী মানুষের মনও উতলা হয়। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিটি যদি স্বভাবধর্মে 'কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ী' হয়েও কপালবৈগুণ্যে দূরবর্তী হয় তা হলে তার বেদনা কি বলে শেষ করা যায়? "এই শ্লোকে উপমেয় কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়ী যক্ষের বিরহ যাতনাকে উপমান সুখী ব্যক্তিদের চেয়ে বহুগুণিত করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ উপমানের চেয়ে উপমেয়ের প্রাধান্য বা ঔৎকর্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুগভীর দার্শনিক অনুভবদীপ্ত অলঙ্কারটি হল ব্যতিরেক।" (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

পূর্বমেঘের আর একটি শ্লোক—

রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং

ভক্তিচ্ছেদৈরিববিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।। (পূ.মে. ১৯)

এই শ্লোকের মর্মার্থ এই যে মেঘ তার যাত্রাপথে উপলবিষম বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে শীর্ণা-বিশীর্ণা বেরা নদীকে দেখতে পাবে। কেমন রেবা নদীকে? না হাতির গায়ে ভক্তিচিহ্ন-প্রকাশক বিচিত্রভাবে আঁকা শৃঙ্গারলেখার মতো রেবা নদীকে। এখানে পরপর দুটি ভিন্নধর্মী অলঙ্কারের একত্রে সমাবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে—প্রথমটি সমাসোক্তি, দ্বিতীয়টি পূর্ণোপমা। যেখানে প্রকৃতি জগতের রেবানাম্নী স্রোতস্বিনীকে প্রাণধর্মে প্রোজ্জ্বল ভক্তিমতী নায়িকারূপে কল্পনা, সেখানে বিভাসিত হয়েছে সমাসোক্তি অলঙ্কারের

দীপ্তি। আর যেখানে উপমেয় রেবার উপরে ভক্তিতে বিরচিত ভূতিচিহ্ন রূপ উপমানের সাদৃশ্যারোপ এবং তাদের মধ্যেকার সাধারণ ধর্ম 'ভক্তি' ও তুলনাবাচক শব্দ 'ইব'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে ঝলসে উঠেছে পূর্ণোপমা অলঙ্কারের লাবণ্য-সুষমা। সমগ্র পূর্বমেঘে এরূপ অনেকগুলি উজ্জ্বল-সুন্দর অলঙ্কারের পরিচয় আছে যাদের সাধারণ নাম উপমা।

উত্তরমেঘেও অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এই পর্বের প্রথম শ্লোক 'বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতা সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ....' ইত্যাদি। সমগ্র স্তবকটি পূর্ণোপমা এবং একই সঙ্গে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের পূর্ণোপমা। এখানে বৈচিত্র্যমণ্ডিত অলকার প্রাসাদসমূহকে মেঘের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। এখানে প্রাসাদ উপমেয় এবং উপমান মেঘ। উপমেয় প্রাসাদের গুণৈশ্বর্য তার মণিকুট্টিম, সুন্দরী রমণী, চিত্র, সঙ্গীত, মুরজধ্বনি, মেঘস্পর্শিতা, অন্যদিকে উপমান মেঘের গুণৈশ্বর্য তার বিদ্যুৎপ্রিয়া, ইন্দ্রধনু, স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদ, জলগর্ভিতা ও সমুন্নতি। ঐ সকল বিশেষত্ব নিয়েই উপমেয় ও উপমানের মধ্যেকার সাদৃশ্য কল্পনা। বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের পূর্ণোপমা অলঙ্কারে ''উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আভাসিত হয়। এখানে উপমেয় অলকার প্রাসাদের সঙ্গে উপমান মেঘের বিম্ব-প্রতিবিম্ব সাদৃশ্য বর্তমান। এই সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে বিদ্যুৎপ্রিয়া মেঘের সঙ্গে সুন্দরী বণিতাপূর্ণ প্রাসাদের, মেঘের ইন্দ্রচাপের সঙ্গে প্রাসাদের চিত্রাবলীর, মুরজবাদ্যের সঙ্গে স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদের, মেঘের জলগর্ভিত অবস্থার সঙ্গে প্রাসাদের মণিময় কুট্টিমের (মেঝের) এবং মেঘের অত্যুচ্চতার সঙ্গে অলকার অভ্রংলিহ প্রাসাদ শিখরের। কবিকল্পনার এই সমুন্নতির বিষয়টি লক্ষ্য করেই বোধ করি মল্লিনাথের সপ্রশংস মন্তব্য—'বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবেনেয়ং পূর্ণোপমা।'' (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা, ২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

উত্তরমেঘের 'তন্বীশ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' (উ.মে. ২১)—শীর্ষক শ্লোকটি মালোপমা অলঙ্কারের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই শ্লোকে উপমেয় বিধাতার আদি সৃষ্টি যক্ষবধূর দেহশ্রীর সকল উপাদানকে ঘিরে উপমেয়-উপমান সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে মালোপমা অলঙ্কার। এ প্রসঙ্গে উত্তর মেঘের ২২ সংখ্যক শ্লোকটিও বিবেচ্য। 'তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্'—শীর্ষক এই শ্লোকে ''বিরহী যক্ষের আত্মদর্শনে উদ্ভাসিত হয়েছে তার দ্বিতীয় জীবনতুল্য ('জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্), চক্রবাকীর মতো একাকিনী মিতভাষিণী প্রিয়তমার কথা। সুদীর্ঘ বিরহের দিনগুলো কেটে গেছে বলে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিতা সেই যুবতী শিশিরমথিতা পদ্মিনীর (পদ্ম-বধূর) মতো অন্যরূপে পরিণতা (অর্থাৎ শ্রীহীনা)—'শিশির মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্।' এখানে 'চক্রবাকী মিবৈকাম্' ও শিশিরমথিতা পদ্মিনীর অনুষঙ্গে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার নির্মল শ্রীমূর্তিটি দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, দুটি ক্ষেত্রেই পূর্ণোপমা অলঙ্কারের দীপ্তি ফুটেছে যথাক্রমে উপমেয় যক্ষপ্রিয়ার (বালা) সঙ্গে চক্রবাকীর (উপমান) ও শিশির মথিতা পদ্মিনীর (উপমান) অবস্থাগত সাদৃশ্য কল্পনায়। এখানে তুলনাবাচক শব্দ 'বা' (মতো, সদৃশ অর্থে) এবং সাধারণ ধর্ম বিরহাবস্থা-জনিত কৃশতা ব্যঞ্জনায় আভাসিত।'' (মেঘদূত-জিজ্ঞাসা,২য় সং—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) বর্তমান আলোচনায় ব্যবহৃত স্বল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে 'উপমা কালিদাসস্য'—কথাটি গভীরতা ও খাঁটিত্ব সপ্রমাণ হয়।

একক - ৮

পূর্ব মেঘ ও উত্তরমেঘ

বিন্যাসক্রম

৬.২.৮.১ পূর্ব মেঘ ও উত্তর মেঘ

৬.২.৮.২ বাংলা অনুবাদে মেঘদূত

৬.২.৮.৩ উজ্জীবনী

৬.২.৮.৪ মেঘদূত' (উত্তর মেঘ) কাব্যে ব্যবহৃত সুভাষিত

৬.২.৮.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.২.৮.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.২.৮.১ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের দুটি ভাগ—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। প্রশ্ন জাগে, মূল কাব্যটি কি আদৌ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এইভাবে পরিচিত ছিল, না কি অবিভাজিত কাব্যটিরই সাধারণ শিরোনাম ছিল

মেঘদূত? এ প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের জানা নেই। তবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ মনীষী মেঘদূত কাব্যের পূর্ব ও উত্তর বিভাজনকে মেনে নিয়েছেন। মেঘদূতের বাংলা অনুবাদকগণের সকলেই কাব্যটির পর্ব বিভাজনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধ গ্রন্থে, 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ও বিভিন্ন কাব্য কবিতায় মেঘদূত কাব্যের খণ্ড বিভাজনকে স্বীকার করেই দুটি খণ্ডের অন্তর্লীন ভাব-ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করেছেন। তদবধি তাঁর মেঘদূত কাব্যের সমালোচনা উদ্দিষ্ট কাব্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা রূপে বিদ্বৎসমাজ-কর্তৃক গৃহীত হয়ে এসেছে। তৎসত্ত্বেও কাব্যটিকে অখণ্ড কাব্যরূপে গ্রহণ করলেও তার রসাস্বাদনে ও উপলব্ধিতে কোনো হেরফের হবে বলে আমাদের মনে হয় না।

৬.২.৮.২ অনুবাদে মেঘদূত

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কালিদাসীয় সাহিত্যের অনুশীলন প্রায় নেই বললেই চলে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গলে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কালিদাসের কবিতাপংক্তির কিম্বা ভাবাভিব্যক্তির ছিটেফোঁটা থাকলেও তা নগণ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সুদীর্ঘ নয় শত বছরের ইতিহাসে কেবল টোল-চতুষ্পাঠীর বিদ্যাচর্চায় কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি গৃহীত হলেও তার বাইরের বৃহত্তর সাধারণ জনমানসে তাদের কোনো পরিচিতি বা প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাসক প্রাগ্রসর বাঙালি জাতির পক্ষে বিষয়টি নিশ্চয়ই গর্বের নয়। যে প্রাচ্য মহাদেশ কালিদাসের মতো একজন মহান কবিকে পেয়ে ধন্য হয়েছিল তারই একাংশে—বাংলাদেশে তাঁর সাহিত্য এতকাল অনাদৃত ছিল এটা ভাবলে লজ্জাবোধ হয়।

বস্তুত উনিশ শতকে ভারতপ্রেমী কতিপয় বড়ো ইংরেজ এদেশে না এলে বিশেষ করে বাঙালি সারস্বত সমাজে কালিদাস প্রায় অপরিচিতই থেকে যেতেন। আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে স্যার উইলিয়ম জোন্স ও হোরেস হেম্যান উইলসনের মতো বিদ্বান মনীষী এদেশে এসেছিলেন। ১৭৮৯ সালে প্রাচ্য বিদ্যার্ণব Sir William Jones কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমের কিয়দংশ জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ফলে তাঁর সময়ে ও তাঁর পরবর্তীকালে বহু শিক্ষিত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে পড়েন। এই সূত্রেই ১৮১৩ সালে Horace Hayman Wilson কালিদাসের মেঘদূত কাব্য ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে 'The Megha Duta or Cloud Messenger' শিরোনামে প্রকাশ করলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতঃপর শুরু হয় কালিদাসচর্চা—কালিদাসীয় সাহিত্যের অনুসরণ-অনুশীলন-ভাষ্যরচনা-অনুবাদ প্রভৃতি। মেঘদূতের প্রথম অনুবাদক আনন্দচন্দ্র শিরোমণি। ১৮৫০ সালে গদ্যভাষায় তিনি মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করেন। আর কাব্যটির প্রথম কাব্যানুবাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৫৯ সালে তাঁর কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

ঊনবিংশ শতকে মেঘদূত-এর কাব্যনুবাদ অথবা গদ্যানুবাদ করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভুবনচন্দ্র বসাক (১৮৬১) প্রাণনাথ পণ্ডিত (১৮৭২), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৮২), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৭), হৃষিকেশ শাস্ত্রী (১৮৯১), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯১), বরদাচরণ মিত্র (১৮৯৩) প্রমুখ বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন।

এই ধারায় বিংশ শতকের বিশিষ্ট অনুবাদক হিসেবে উল্লেখযোগ্যদের নামের তালিকা বিশাল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন—কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত (১৯০৩), সতীশচন্দ্র রায় (১৯০৬), দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯), হরিপদ ভট্টাচার্য (১৯২৫), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯২৫), কবি নরেন্দ্র দেব (১৯২৯), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৩৬), রাজশেখর বসু (১৯৪২), বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৭), কবি কালিদাস রায় (১৯৬৩), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই ধারায় সর্বশেষ সংযোজন অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক-প্রণীত 'মেঘদূত জিজ্ঞাসা' (১৯৯৫)।

———

৬.২.৮.৩ : উজ্জীবনী (দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তরমেঘ-এর প্রথম ১০টি শ্লোকের ব্যাখ্যা)

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥১॥

অন্বয় ঃ যত্র ললিতবনিতাঃ সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ মণিময়ভুবঃ অভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাঃ তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ বিদ্যুৎবন্তং সেন্দ্রচাপং স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ অন্তস্তোয়ং তুঙ্গং ত্বাং তুলয়িতুম্ অলম্।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে, সেই অলকায়, সচিত্রাঃ—চিত্রযুক্ত, চিত্রশোভিত, সঙ্গীতায়—সঙ্গীতের জন্য, প্রহতমুরজাঃ—মুরজধ্বনিযুক্ত, মুরজ ধ্বনিমুখর (মুরজ—পাখোয়াজ), মণিময়ভুবঃ—মণিময় মেঝে-সমন্বিত, মণিকুট্টিম সমৃদ্ধ (কুট্টিম—মেঝে), অভ্রংলিহাগ্রাঃ—অভ্র বা মেঘকে লেহন (আস্বাদন) করে এমন

অগ্রভাগ (শিখর) যুক্ত অর্থাৎ মেঘস্পর্শী, উত্তুঙ্গ, প্রাসাদাঃ—প্রাসাদ সমূহ, সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ, তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ—সেই সেই বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে, বিদ্যুত্বন্তং = বিদ্যুৎবন্তং—সবিদ্যুৎ, সেন্দ্রচাপং—ইন্দ্রচাপযুক্ত, ইন্দ্রধনুযুক্ত, স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্—স্নিগ্ধ-গম্ভীরনাদ, অন্তস্তোয়ং—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, জলগর্ভ, তুঙ্গং ত্বাং—সুমুন্নত তোমাকে (তোমার) তুলয়িতুম্ অলম্—তুলনাই যথেষ্ট (অর্থাৎ একমাত্র তোমারই সমতুল হতে পারে)।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেই অলকার মণিকুট্টিম-সমৃদ্ধ, সুন্দরী রমণীপূর্ণ, চিত্রশোভিত, সঙ্গীতের জন্য (সুমধুর) মুরজ-ধ্বনিমুখর, মেঘস্পর্শী প্রাসাদসমূহ তাদের (পূর্ববর্ণিত) বিশেষত্বগুলি নিয়ে সবিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনুযুক্ত, স্নিগ্ধ-গম্ভীরনাদ, জলগর্ভ ও সমুন্নত তোমার সমতুল হতে পারে ১।।

উজ্জীবনী ঃ বর্তমান শ্লোকটি বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা এবং পূর্ণোপমা অলঙ্কারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'বিম্বপ্রতিবিম্বভাবেনেয়ং পূর্ণোপমা' বলেছেন মল্লিনাথ। যে উপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের ধর্ম ভিন্ন হলেও অনুভবে তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ধরা পড়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রে তাকে বলে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা। এখানে উপমেয় প্রাসাদের সঙ্গে উপমান মেঘের বিম্বপ্রতিবিম্ব সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। এই সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়েছে বিদ্যুপ্রিয়া মেঘের সঙ্গে সুন্দরী বনিতাপূর্ণ প্রাসাদের, মেঘের ইন্দ্রচাপের সঙ্গে প্রাসাদের চিত্রাবলীর, মুরজবাদ্যের সঙ্গে স্নিগ্ধ-গম্ভীর নাদের, জলগভির্ত অবস্থায় সঙ্গে প্রাসাদের কুট্টিমের এবং মেঘের অত্যুচ্চতার সঙ্গে অলকার অভ্রংলিহ প্রসাদ-শিখরের সূক্ষ্ম মিল কল্পনায়। ললিতবনিতাঃ—রম্যা বনিতা অর্থাৎ সুন্দরী রমণী (স্ত্রী), সচিত্রাঃ—আলেখ্যাদি মনোমুগ্ধকর চিত্রাবলী—'আলেখ্যাশ্চর্যয়োশ্চিত্রম্।'—বলেছেন অমরকোষ। মুরজাঃ—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ-শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র—'মুরজা তু মৃদঙ্গে স্যাড্ঢক্কামুরজয়োরপি'—বলেছেন শব্দার্ণব। প্রাসাদ—সুউচ্চ-সুবৃহৎ অট্টালিকা। দেবগৃহ অর্থও গ্রহণযোগ্য—'প্রাসাদো দেবভূভুজাম্' (অমরকোষ)। অলম্—বাক্যালঙ্কার অব্যয়—যথেষ্ট পর্যাপ্ত অর্থদ্যোতক—'অলং ভূষণপর্যাপ্তি শক্তিবারণবাচকম্' বলেছেন অমরকোষ।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।। ২।।

অন্বয় ঃ যত্র বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্ অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্ আননে শ্রীঃ লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতাং নীতা চূড়াপাশে নবকুরুবকম্ চারুকর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং নীপম্ (অস্তি)।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে অলকায়, বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্—বধূদের হাতে (রয়েছে) লীলাকমল, অলকে—চূর্ণকুন্তলে, অলকে, বালকুন্দানুবিদ্ধম্ = বাল-কুন্দ-অনুবিদ্ধম্—সদ্যফোটা কুন্দকলির অনুবেধ বা গাঁথনি, আননে—মুখে, শ্রীঃ—শ্রী, সৌন্দর্য, লোধ্রপ্রসবরজসা—লোধ্রফুলের রজঃ বা পরাগরেণুতে, পাণ্ডুতাং নীতা—পাণ্ডুতা বা শুভ্রাবস্থা প্রাপ্ত, চূড়াপাশে নবকুরুবকম্—কেশপাশে নবজাত কুরুবক ফুল, চারুকর্ণে শিরীষং—সুন্দর কানদুটিতে শিরীষফুল অথবা কানে সুন্দর শিরীষফুল, সীমন্তে চ—আর সীমন্ত বা সিঁথিতে, ত্বদুপগমজং—তোমার আগমনে ফুটে ওঠা, নীপম্—কদম্ব ফুল (অস্তি—আছে)।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) যে অলকায় বধূদের হাতে রয়েছে লীলাকমল, অলকে সদ্যফোটা কুন্দকলির অনুবেধ বা গাঁথনি, মুখে লোধ্রফুলের পরাগরেণুতে মাখা শুভ্র শ্রী, কেশপাশে নবকুরুবক, সুন্দর কান দুটিতে শিরীষ ফুল (অথবা কান দুটিতে সুন্দর শিরীষ ফুল) আর সিঁথিতে আছে তোমার আগমনে ফুটে ওঠা নীপ (কদম ফুল)। ২॥

উজ্জীবনী ঃ লীলাকমল—'লীলার্থং কমলং লীলাকমলম্'—রমণীর বিলাস ক্রীড়া বা শৃঙ্গার চেষ্টার সহায়ক পদ্মফুল। সেকালে ফুল ছিলো রমণীদের অঙ্গসজ্জা ও খেলাধুলার অন্যতম উপকরণ। বিশেষতঃ পদ্মফুল নিয়ে পরস্পর লোফালুফি করে মেয়েরা খেলাধুলা করত। এই বিষয়েরই সাজানো নাম 'কন্দুকক্রীড়া'—বল খেলা। লীলা-বিলাসের উপকরণ হিসেবে পদ্মফুলের পাপড়ি গণনা মেয়েদের সহজাত ক্রীড়াপ্রকাশক। তাই কুমারসম্ভবে বিবাহ প্রস্তাবে সলজ্জা রক্তিমাভা পার্বতীর লীলাকমলের পত্রগণনা—'লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পাবর্তী।' (কু.স.৬.৮৪) আবার 'লীলা' অর্থে শোভন অলঙ্কার ও পোষাক-পরিচ্ছদ-ভূষিতা রমণীর প্রিয়ানুকরণ ('প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যবেশক্রিয়াদিভিঃ'—উজ্জ্বলনীলমণি) ধরে নিয়ে লীলাকমলের অর্থ করা যায়—সুরভিত পদ্মফুল হাতে সুন্দরী বনিতার প্রিয়ানুসরণ। লোধ্রপ্রসব—লোধ্র (শীতকালে ফোটে এমন এক ধরনের ফুল) ফুলের প্রসব অর্থাৎ প্রস্ফুটন—'প্রসবস্তু ফলে পুষ্পে বৃক্ষাণাং গর্ভমোচনে' বলেছেন বিশ্বকোষ। এই স্তবকে অনেকগুলি গন্ধপুষ্পের পরিচয় আছে যেগুলি বিভিন্ন ঋতুপর্যায়ের। যেমন—কমল—শরতের, কুন্দ—হেমন্তের, লোধ্র—শীতের, কুরুবক—বসন্তের, শিরীষ—গ্রীষ্মের আর কদম্ব—বর্ষার। ষড়ঋতুতে বিকশিত ফুলগুলির একই কালে একত্র সমাবেশে অনেক সমালোচক অস্বস্তিতে পড়েছেন। আসলে অলকা এমনই এক ভাবলোক যেখানে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদির আপাত ভেদ বলে কিছু নেই। সেই কল্পলোকে সকল ঋতুই তাদের ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে একই কালে ভব-ভবানী তথা মেঘের অভ্যর্চনায় নিত্য-নিরত। সেই স্বপ্নলোকে কাব্যের কল্পলতায় ফুটল ফুটলে যুক্তিবাদী তার্কিকের বিচার বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, কিন্তু মার্মিক রসবোদ্ধার তাতে কি যায় আসে? কারণ এই ভাবরসের জগৎ আনন্দের জগৎ, সর্বোপরি সাহিত্যের জগৎ। সুতরাং বস্তুজগতের চুলচেরা বিশ্লেষণে তার মাধুর্যের অঙ্গহানি করে কি লাভ? পূর্ণ সরস্বতী অবশ্য এর একটি গ্রহণযোগ্য রসব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, ষড়ঋতুতে পুষ্পের কালাতিক্রমী একত্র সমাবেশ আসলে চাটুকারিতার দ্বারা মেঘকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই—'মেঘস্য চাটুকরণার্থম্।'

রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' (কল্পনা) ও 'সেকাল' (ক্ষণিকা) কবিতায় উত্তরমেঘের এই শ্লোকটির ভাবরসঘন স্বীকৃতি কাব্যের রসধ্বনি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে প্রথমে কবির পূর্ব জন্মের প্রথমা প্রিয়ার বর্ণনায়—

"মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।" "স্বপ্ন" (কল্পনা)

এবং পরে কবির মানসী প্রিয়ার বর্ণনায়—

"কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।" সেকাল (ক্ষণিকা)

এই শ্লোকের কাব্যানুবাদ প্রসঙ্গে তুলনীয় ঃ

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মাঃ নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥ ৩॥

অন্বয় ঃ যত্র পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ (অতঃ) উন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ নলিনাঃ নিত্যপদ্মাঃ (অতঃ) হংসশ্রেণীরচিতরশনাঃ ভবনশিখিনঃ নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ (অতঃ) কেকোৎকণ্ঠাঃ প্রদোষাঃ নিত্যজ্যোৎস্নাঃ (অতঃ) প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ (ভবন্তি)।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে অলকায়, পাদপাঃ—বৃক্ষগুলি, নিত্যপুষ্পাঃ—সর্বদা পুষ্পশোভিত, (অতঃ—সেই জন্য) উন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ—মত্ত ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, নলিন্যঃ—জলাশয়গুলি, নিত্যপদ্মাঃ—নিত্য (সর্বদা) পদ্ম-প্রস্ফুটিত, (অতঃ—এজন্য), হংসশ্রেণী-রচিত-রশনাঃ—হংসমালা দ্বারা রচিত মেখলা (চন্দ্রহার), ভবনশিখিনঃ—গৃহপালিত ময়ূরগুলি, নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ—নিত্যই উজ্জ্বল (ঝলমলে) কলাপ বিস্তার করে আছে, (অতঃ—তাই), কেকোৎকণ্ঠাঃ—কেকাধ্বনিতে উৎকণ্ঠ (গলা-উঁচু), প্রদোষাঃ—প্রদোষ বা সন্ধ্যাকাল, নিত্যজ্যোৎস্নাঃ—নিত্য জ্যোৎস্নাময়, (অতঃ—এই কারণে) প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ—অন্ধকারের ব্যাপ্তি বা প্রসারতা (নিবারণ) করে রম্য—রমণীয়, (ভবন্তি—হয়।)

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) যে অলকায় (অর্থাৎ সেই অলকায়) বৃক্ষগুলি সর্বদাই পুষ্পশোভিত এবং মত্তভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, পুষ্করিণী বা জলাশয়গুলি নিত্য পদ্মপ্রস্ফুটিত এবং হংসমালার বেষ্টনে রচিত-মেখলা (চন্দ্রহার), গৃহপালিত ময়ূরগুলি সর্বদাই উজ্জ্বল কলাপ বিস্তার করে কেকাধ্বনিতে উৎকণ্ঠ, প্রদোষ বা সন্ধ্যাকাল সেখানে নিত্য জ্যোৎস্নাময় এবং অন্ধকারের প্রসারতা প্রতিহত করে রমণীয় হয়ে থাকে। ৩॥

উজ্জীবনী ঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ ইত্যাদি—অলকা চিরসৌন্দর্যের লীলাভূমি। তাই সৌন্দর্যের উপকরণগুলি সেখানে সবসময় মজুত। নলিনী শব্দের সাধারণ অর্থ জলজ-নলযুক্ত, তার থেকে নলযুক্ত অম্বুজ বা পদ্ম। 'নলানি অম্বুজানি অস্যাঃ স্যন্তি ইতি নলিনী', এবং পদ্ম—'পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্'। (অমরকোষ)। এই সূত্রে নলিন্ বা পদ্মের আশ্রয় নলিনী অর্থাৎ জলাশয় বা পুষ্করিণী—এরূপ অর্থ করেছেন অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। (দ্রঃ মেঘদূত পরিচয়—৪র্থ সং পৃঃ ১৫৫) আবার রাজশেখর বসু নলিনী > নলিন্যঃ (বহু ব.) শব্দের অর্থ করেছেন 'পদ্মের ঝাড়'। এ ক্ষেত্রে পুষ্করিণী বা জলাশয় অর্থ সমধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। রবীন্দ্র কবিতায় এই শ্লোকের আংশিক ভাবানুষঙ্গ—

"অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে....." 'মেঘদূত' (মানসী)

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।

নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্‌বিপ্রয়োগপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি। ৪॥

অন্বয় ঃ যত্র বিত্তেশানাং নয়নসলিলং আনন্দোত্থম্ (ভবতি) অন্যঃ নিমিত্তৈঃ ন (ভবতি) ইষ্টসংযোগসাধ্যাৎ কুসুমশরজাৎ অন্যঃ তাপঃ ন (ভবতি) প্রণয়কলহাৎ অন্যস্মাৎ (কারণাৎ) বিপ্রয়োগপপত্তিঃ অপি ন অস্তি যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ চ নাস্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যে অলকায়, বিত্তেশানাং নয়নসলিলং—ধনপতিদের (যক্ষগণের) অশ্রু, চোখের জল, আনন্দোত্থম্ (ভবতি)—আনন্দ থেকেই নির্গত হয়, অন্যৈঃ নিমিত্তৈঃ ন (ভবতি)—অন্য কোনো কারণে হয় না, ইষ্টসংযোগসাধ্যাৎ—প্রিয় সমাগমে সাধ্য, কুসুমশরজাৎ—মদনসন্তাপ (ছাড়া), অন্যঃ তাপঃ ন (ভবতি)—অন্য তাপ হয় না, প্রণয়কলহাৎ—প্রণয়কলহ ছাড়া, অন্যস্মাৎ (কারণাৎ)—অন্য কোনো কোরণে, বিপ্রয়োগপপত্তিঃ অপি ন অস্তি—বিপ্রয়োগ বা বিচ্ছেদের, উপপত্তি—প্রাপ্তি নেই অর্থাৎ বিচ্ছেদও ঘটে না, যৌবনাৎ অন্যৎ—যৌবন ব্যতীত অন্য কোনো, বয়ঃ চ নাস্তি—বয়সও নেই (যৌবনই হল বয়সের ঊর্ধ্বসীমা অর্থাৎ অনন্ত যৌবন)।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে ধনপতিদের (যক্ষদের) চোখের জল আনন্দ থেকেই নির্গত হয়, অন্য কোনো কারণে নয় ; প্রিয়সমাগমসাধ্য (প্রত্যাশিত) মদনসন্তাপ ছাড়া অন্য কোনো তাপ নেই, প্রণয়কলহ ছাড়া অন্য কোনো কারণে বিচ্ছেদও ঘটে না এবং (সেখানে) যৌবন ব্যতীত বয়সও নেই (অর্থাৎ যৌবনই হল বয়সের ঊর্ধ্বসীমা, অতএব অলকায় অনন্ত যৌবন।৪॥

উজ্জীবনী ঃ যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ চ নাস্তি—যৌবন ছাড়া অন্য কোন বয়সও নেই। মানব জীবনের চারটি পর্যায়—বাল্য-কৈশোর-যৌবন ও বার্ধক্য। কিন্তু দেবভূমি অলকার দেবযোনিদের বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। স্বর্গের দেবতাদের মতো তারাও যে বাল্য-কৌমার-যৌবন-এই তিন দশার অধিকারী ত্রিদশ। তাই সেখানে মানবোচিত জরা-ব্যাধি-মৃত্যুও নেই, আছে অনন্ত-অক্ষয় যৌবন। কিন্তু চিরন্তন সুখ ও আনন্দের বিলাসভূমি এই অলকা—ব্যঞ্জনায় এই ভাবটি পরিস্ফুট হচ্ছে। বিত্তেশানাং শব্দের বাচ্যার্থ বিত্তশালীদের। কিন্তু প্রসারিত অর্থ ধনী যক্ষদের—'বিত্তাধিপঃ কুবেরঃ স্যাৎ প্রভৌ ধনিক যক্ষয়োঃ'—বলেছেন শব্দার্ণব।

*মল্লিনাথ শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। একথা সত্য হলেও শ্লোকটি যে শক্তিমান কোনো কবির রচনা তাতে সন্দেহ নেই।

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু॥৫॥

অন্বয় ঃ যস্যাং (অলকায়াং) যক্ষাঃ উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ (সন্তঃ) সিতমণিময়ানি জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতানি হর্ম্যস্থলানি এত্য ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু পুষ্করেষু শনকৈঃ আহতেষু (সৎসু) কল্পবৃক্ষপ্রসূতং রতিফলং মধু আসেবন্তে।

শব্দার্থ ঃ যস্যাং (অলকায়াং) —যে অলকায়, যক্ষাঃ—যক্ষরা, উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ (সন্তঃ)—সুন্দরী স্ত্রীসহ, সিতমণিময়ানি—শাদা মণিখচিত, চন্দ্রকান্তমণিময়, জ্যোতিশ্ছায়া-কুসুমরচিতানি—নক্ষত্র-প্রতিবিম্বস্বরূপ কুসুম-রচিত, হর্ম্যস্থলানি এত্য—হর্ম্যস্থলে বা সুউচ্চ প্রাসাদের ছাদে গিয়ে, ত্বদ্‌গম্ভীরধ্বনিষু—তোমার মতো গম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট, পুষ্করেষু—বাদ্যভাণ্ডমুখে, শনকৈঃ—মৃদুস্বরে, আহতেষু (সৎসু)—বাজতে থাকলে, কল্পবৃক্ষপ্রসূতং—কল্পবৃক্ষপ্রসূত, রতিফলং—রতিফল নামক, মধু-মদ্য, পানীয়, আসেবন্তে —পান করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (সখা!) সেই অলকায় যক্ষগণ সুন্দরী স্ত্রীসহ শাদা মণিখচিত (চন্দ্রকান্তমণিময়) নক্ষত্র প্রতিবিম্বরূপ কুসুম-রচিত সুউচ্চ প্রাসাদের ছাদে গিয়ে তোমার মতো গম্ভীর ধ্বনিবিশিষ্ট বাদ্যভাণ্ডমুখে মৃদুস্বর ধ্বনিত হতে থাকলে কল্পবৃক্ষপ্রসূত 'রতিফল' নামক মদ্য পান করে।৫॥

উজ্জীবনী ঃ হর্ম্যস্থলানি—সপ্ততলবিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদকে বলে হর্ম্য। হর্ম্যের স্থল > তল বা মেঝে, পূর্ণসরস্বতী অর্থ করেছেন 'সৌধশিখরকুট্টিমানি' অর্থাৎ ছাদগুলি। কল্পবৃক্ষ —স্বর্গীয় বনস্পতি যার কাছে প্রার্থনা করলে কাম্য বস্তুসকল পাওয়া যায়। জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতানি—জ্যোতিশ্ছায়া—নক্ষত্র বা তারকাদের ছায়া (প্রতিবিম্ব) ইব কুসুমানি—প্রতিবিম্বস্বরূপ কুসুম, তৈঃ রচিতানি—পরিষ্কৃতানি—তা দিয়ে রচিত—পরিষ্কৃত অর্থাৎ নক্ষত্রদের প্রতিফলিত আলোরূপ পুষ্পরচনার দ্বারা পরিষ্কার। পুষ্কর—বাদ্যভাণ্ডমুখ—'পুষ্করং করিহস্তাগ্রে বাদ্যভাণ্ডমুখে জলে' বলেছেন অমরকোষ। শনকৈঃ আহতেষু (সৎসু) মৃদুস্বরে বাদ্য প্রভৃতি নৃত্যগীতাদির উপলক্ষ্য বা অনুষঙ্গ। রতিফল—'রতিফল' নামক মদ্য—মদিরার্ণবে এই পানীয় তৈরির উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা আছে। বিভিন্ন বৃক্ষ-লতা-পুষ্পদ্রুম প্রভৃতির ক্বাথ একসঙ্গে মিশিয়ে এই 'স্মরদীপনং রতিফলাখ্যং স্বাদু শীতং মধু' তৈরি হয়। সিতমণি—মল্লিনাথের টীকানুসারে স্ফটিক অথবা চন্দ্রকান্তমণি।

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামণিতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥৬॥

অন্বয় ঃ যত্র অমরপ্রার্থিতাঃ কন্যাঃ মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ মরুদ্ভিঃ সেব্যমানাঃ (সন্তঃ) অনুতটরুহাং মন্দারাণাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ (সন্তঃ) কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ অন্বেষ্টব্যৈঃ মণিভিঃ সংক্রীড়ন্তে।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে (সেই অলকায়), অমরপ্রার্থিতাঃ কন্যাঃ—অমর বা দেবগণের প্রার্থিতা—আকাঙ্ক্ষিতা কন্যারা, মন্দাকিন্যাঃ—মন্দাকিনীর, সলিলশিশিরৈঃ—শীতল জলে, হিমসলিলে, মরুদ্ভি—বায়ুদ্বারা, সেব্যমানাঃ (সন্তঃ)—সেব্যমান, সেবিত, সেবা-পরিচর্যাপ্রাপ্ত (হয়ে), অনুতটরুহাং—তটজাত, মন্দারাণাং ছায়য়া—মন্দার বা পারিজাত বৃক্ষের ছায়া দ্বারা, বারিতোষ্ণাঃ (সন্তঃ)—শমিত (নিবারিত) তাপ হয়ে, কনক-সিকতা-মুষ্টি-নিক্ষেপগূঢ়ৈঃ—মুঠো মুঠো স্বর্ণবালুকা ছড়িয়ে, অন্বেষ্টব্যৈঃ মণিভিঃ—মণিগুলোকে খোঁজার বিষয় করে, সংক্রীড়ন্তে—খেলা করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত কন্যারা মন্দাকিনীর হিমসলিল বাহিত বায়ু দ্বারা সেবিত ও তটজাত মন্দার বা পারিজাতবৃক্ষের ছায়া দ্বারা শমিত (নিবারিত)-তাপ হয়ে মুঠো মুঠো স্বর্ণ বালুকা ছড়িয়ে (চাপা দেওয়া) মণিগুলোকে (আবার) খোঁজার খেলা খেলে।৬॥

উজ্জীবনী ঃ মন্দাকিনী—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—মন্দগামিনী, মূল অর্থ—আকাশগঙ্গা—"গঙ্গার যে প্রধান ধারা স্বর্গে গমন করে তার নাম মন্দাকিনী। এই ধারা বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে এসেছে।" ('পৌরাণিক অভিধান'—সুধীর চন্দ্র সরকার-সংকলিত, ৩য় সং পৃ. ৪১৫) শিশির—হিমযুক্ত শীতল; এছাড়াও বহু অর্থ হয়। অমরকোষের টীকায় এমন মজার ব্যাখ্যায় শিশির শব্দের অর্থ 'স্বামী'—'শিরোহত্যর্থং শ্যায়তেহনেনেতি শিশিরঃ ইতি স্বামী।' সিকতা—বালুকা (সৈকত জাত অর্থে), অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা.....সংক্রীড়ন্তে—স্বর্ণবালুকার স্তূপে মণি লুকিয়ে রেখে পুনরায় তাকে খুঁজে বের করা অনূঢ়া অলকা-কন্যাদের একপ্রকার জনপ্রিয় খেলা (Popular game)। শব্দার্ণবে এইরূপ কতকগুলি খেলাকে দেশজ খেলা (দৈশিক-ক্রীড়া) বলা হয়েছে যার মধ্যে বর্তমান 'গুপ্তমণিখেলা' ('কুমারিভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমণিঃ স্মৃতা।') বিখ্যাত—"রাসক্রীড়া গূঢ়মণির্গুপ্তকেলিস্তুলায়নম্। পিণ্ডকন্দুকদণ্ডাদ্যৈঃ স্মৃতা দৈশিককেলয়ঃ।" মন্দার—মন্দার বৃক্ষ, স্বর্গের পারিজাতফুলের গাছ, বাংলায় মন্দার>মাদার গাছ।

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥৭॥

অন্বয় ঃ যত্র অনিভৃতকরেষু প্রিয়েষু নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং ক্ষৌমং রাগাৎ আক্ষিপৎসূ (সৎসু) হ্রীমূঢ়ানাং বিম্বাধরাণাং চূর্ণমুষ্টিঃ অর্চিস্তুঙ্গান্ রত্নপ্রদীপান্ অভিমুখং প্রাপ্য অপি বিফল-প্রেরণা ভবতি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে অর্থাৎ সেখানে, অনিভৃতকরেষু—চপল, চঞ্চল হস্তে, প্রিয়েষু—প্রণয়িগণ, নীবীবন্ধ-উচ্ছ্বসিতশিথিলং—নীবীবন্ধ—কটিবন্ধন মোচনে শিথিল, (আলগা) ক্ষৌমং—ক্ষৌমবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র, রাগাৎ—অনুরাগবশতঃ, আক্ষিপৎসু (সৎসু)—আক্ষিপ্ত করে, টেনে ধরে এমন, হ্রীমূঢ়ানাং—হ্রী—লজ্জা অতএব লজ্জায় মুগ্ধ বা অভিভূত, লজ্জাবিধুরা, বিম্বাধরাণাং—বিম্বফলের ন্যায় অধরবিশিষ্টাদের, বিম্বাধরাদের, চূর্ণমুষ্টিঃ—(নিক্ষিপ্ত) চূর্ণমুষ্টি (হাতে ধরা কুঙ্কুমাদিচূর্ণ), অর্চিস্তুঙ্গান্—উজ্জ্বল শিখাযুক্ত, রত্নপ্রদীপান্—রত্নপ্রদীপগুলির, অভিমুখং প্রাপ্য—অভিমুখে বা সম্মুখে গিয়েও, বিফলপ্রেরণা—যাদের প্রেরণা বা উদ্যম বিফল, ভবতি—হয়।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে প্রণয়ীরা অনুরাগবশতঃ চপল হাতে (প্রেয়সীদের) কটিদেশের বন্ধন আলগা করে দিয়ে রেশমী কাপড় টেনে ধরে (হরণ করে), (ফলে) লজ্জাবিধুরা বিম্বাধরাগণ উজ্জ্বল রত্নদীপাবলির অভিমুখে বৃথাই চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপ করে। (অর্থাৎ চূর্ণমুষ্টি নিক্ষেপেও প্রদীপ নেভে না কারণ সেগুলি রত্নপ্রদীপ)।৭॥

উজ্জীবনী ঃ নীবীবন্ধ-নীবী (নীবি) কটিদেশ, অতএব—কটিদেশের বা কোমরের বস্ত্রধারক বাঁধন অর্থাৎ বসনগ্রন্থি,—'নীবী পরিপণে গ্রন্থৌ স্ত্রীণাং জঘনবাসসি'—বলেছেন বিশ্বকোষ, তার বন্ধন—নীবীবন্ধ। বিম্বাধরা—বিম্বফলের (তেলাকুচা ফলের) ন্যায় রক্তিমাভ অধর বা মুখরুচি যে সকল বনিতাদের। 'বিম্বং

ফলে বিম্বিকায়াঃ প্রতিবিম্বে চ মণ্ডলে' বলেছেন বিশ্বকোষ। বিম্বাধরা বনিতার বিশেষণ অতএব স্ত্রীবিশেষ। শব্দার্ণবে আছে 'বিশেষাঃ কামিনীকান্তা ভীরুবিম্বাধরাঙ্গনাঃ'—অর্থাৎ 'কামিনী, কান্তা, ভীরু বিম্বাধরা অঙ্গনা প্রভৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীবাচক শব্দ। হ্রীমূঢ়া—লজ্জায় মুগ্ধা, মল্লিনাথের ভাষায় রত্নপ্রদীপ-নির্বাপণরতা নায়িকাদের বিমুগ্ধ ভাব—'অত্র অঙ্গনানাং রত্নপ্রদীপনির্বাণপ্রবৃত্তা মৌগ্ধ্যং বজ্যতে।' এক্ষেত্রে পূর্ণসরস্বতী বলবেন—অঙ্গনাদের এই হ্রীমূঢ়তা আসলে প্রিয়তমদের হৃদয়রসায়নের জন্যই—'প্রিয়তম—হৃদয়রসায়নং চ ধ্বন্যতে।' চূর্ণমুষ্টি—মুঠো মুঠো কুঙ্কুম—কস্তুরাদি গন্ধদ্রব্যচূর্ণ। এই সমস্ত গন্ধদ্রব্যের গুঁড়ো (Powder) দিয়ে নায়িকার অঙ্গরাগ বিধানের ব্যবস্থা ছিল সেকালে। নীবীবন্ধ শিথিল করে দেওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গে এই শ্লোকে নায়ক-নায়িকার শৃঙ্গার-বিলাসের দ্যোতনা আছে। কারণ 'রতিচক্রে প্রবৃত্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ'—তাই প্রণয়ীগণের অধীর চাপল্য এবং নায়িকাদের অন্তঃসঙ্গ-রসায়ন-জনিত বিমূঢ় ভ্রান্তি। এই ভাবেরই অন্য এক অভিব্যক্তি (ঈষৎ ভিন্নভাবে) লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কবিতায়। হ্রীমূঢ়া কামিনীদের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, প্রিয়সমাগমে তাঁর নায়িকাদের—অলকা বিম্বাধরাদের ঠিক বিপরীত ভাব—একটু বেশি বেশরম তারা। তাই 'শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।'

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্‌বিমানাগ্রভূমি-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকা 'দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কা স্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈঃ
ধূমোদগারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরাঃ নিষ্পতন্তি।৮।।

অন্বয় ঃ যত্র ত্বাদৃশাঃ জলমূচঃ নেত্রা সততগতিনা যদ্‌বিমানাগ্রভূমিঃ নীতাঃ (সন্তঃ) আলেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষম্ উৎপাদ্য সদ্যঃ শঙ্কা স্পৃষ্টাঃ ইব ধূমোদগারানুকৃতিনিপুণাঃ জর্জরাঃ (চ সন্তঃ) জালৈঃ নিষ্পতন্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—যেখানে অর্থাৎ সেখানে, ত্বাদৃশাঃ জলমূচঃ—তোমার মতো, ত্বৎসদৃশ, মেঘদল, নেত্রা সততগতিনা—সর্বদা গতি বায়ুদ্বারা, নেত্রা—প্রেরিত, পরিচালিত, যদ্-বিমানা-অগ্রভূমিঃ—যে (অলকার) বিমান—সাততলা ভবন, অগ্রভূমি—সর্বোচ্চ তলা, নীতাঃ (সন্তঃ)—নীত প্রাপ্ত (হয়ে) পৌঁছে, আলেখ্যানাং—আলেখ্য বা ছবিগুলির, স্বজলকণিকাদোষম্ উৎপাদ্য—নিজের জলকণার দোষ উৎপাদন করে, দূষিত করে (অর্থাৎ ভিজিয়ে দিয়ে) সদ্যঃ—তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, শঙ্কা স্পৃষ্টাঃ ইব—শঙ্কা গ্রস্তের, ভয়ত্রস্তের ন্যায়, ধূম-উদগার-অনুকৃতিনিপুণাঃ—ধূম উদ্‌গীরণের অনুসরণে নিপুণ, জর্জরাঃ (চ সন্তঃ)—বিশীর্ণ হয়ে, জালৈঃ—গবাক্ষ পথে, জানালা দিয়ে, নিষ্পতন্তি—নিষ্ক্রান্ত হয়, বেরিয়ে যায়।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে তোমার মতো বায়ুপ্রেরিত মেঘদল (অলকার) সাততলা উঁচু ভবনগুলিতে প্রবেশ করে নিজেদের জলকণায় (দেওয়াল স্থিত) ছবিগুলিকে দূষিত করে (অর্থাৎ ভিজিয়ে দিয়ে) তখনই (আবার) ভয়ত্রস্তের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিপুণভাবে বিশীর্ণ হয়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়।৮।।

উজ্জীবনী ঃ সততগতিনা—বায়ুপ্রবাহ নিত্য, তার গতি বা চলাও নিত্য, তাই সততগতি—'মাতরিশ্বা সদাগতিঃ—বলেছেন অমরকোষ। নেত্রা—নেতা-পরিচালক, প্রেরক, তারদ্বারা। আলেখ্য—সচিত্র ছবি—'চিত্রং লিখিতরূপাঢ্যং স্যাদালেখ্যং তু যত্নতঃ'—বলেছেন শব্দার্ণব। জর্জরাঃ—জর্জর—

বিশীর্ণ। 'জলমুচঃ আর জললবমুচঃ' দুটি শব্দের অর্থই জলবর্ষী মেঘ কারণ তারা জলমোক্ষণ বা মোচন করে। জলমুচ্ শব্দের বহুবচন।

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতলিঙ্গনানা—
মঙ্গগ্লানিং সূরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ।।৯।।

অন্বয় ঃ যত্র নিশীথে ত্বৎ সংরোধাপগমবিশদৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ তন্তুজালাবলম্বাঃ চন্দ্রকান্তাঃ প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতলিঙ্গনানাং স্ত্রীণাং সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং ব্যালুম্পন্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—সেখানে (অলকায়), নিশীথে—মধ্যরাত্রে, গভীর রাতে, ত্বৎ সংরোধাপগমবিশদৈঃ—তোমার আবরণ অপগত বা অপসৃত হওয়ায়, খসে পড়ায়, বিশদ শুভ্র-নির্মল), চন্দ্রপাদৈঃ—চন্দ্রকিরণের দ্বারা, স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ—বিন্দু বিন্দু জলকণাবর্ষী, তন্তুজালাবলম্বাঃ—সূত্রমালালম্বিত, সুতোর মালা থেকে লম্বমান (ঝুলছে এমন), চন্দ্রকান্তাঃ—চন্দ্রকান্তমণিগুলি, প্রিয়তম-ভুজ-উচ্ছ্বাসিত-আলিঙ্গনানাং—প্রিয়তমের বাহুতে আলিঙ্গন সুদৃঢ় অথবা শিথিল হয়েছে এমন, স্ত্রীণাং—রমণীদের, কামিনীদের, সুরতজনিতাম্ অঙ্গগ্লানিং—সুরত বা সম্ভোগ জনিত দেহের অবসাদ, ব্যালুম্পন্তি—বিলুপ্ত করে, দূর করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেখানে মাঝরাতে তোমার (কৃষ্ণবর্ণ) আবরণ খসে পড়ায় শুভ্র-নির্মল চন্দ্রকিরণে সূতোর মালায় ঝুলন্ত চন্দ্রকান্তমণিগুলি থেকে বিন্দু বিন্দু জলকণা ঝরে পড়ে প্রিয়তমের সুদৃঢ় অথবা শিথিল বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ কামিনীদের সুরত বা সম্ভোগজনিত অবসাদ দূর করে।৯।।

উজ্জীবনী ঃ নিশীথে—নিশীথ—রাত্রিবাচক শব্দ—'নিশানিশিথিনীরাত্রিস্ত্রিযামাক্ষণদা-ক্ষপা। বিভাবরী-তমস্বিন্যৌ রজনীযামিনী তমী।' (অমরকোষ) এখানে নিশীথে—অর্ধরাত্রে বা গভীর রাতে—'অর্ধরাত্র নিশীথৌ দ্বৌ'—বলেছেন অমরকোষ। মধ্যরাত্রি সম্ভোগকালরূপে চিহ্নিত। 'শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ—ঋতুসংহারে (১.৩) একথা বলেছেন কালিদাস। চন্দ্রপাদ—চন্দ্ররশ্মি—'পাদা রশ্ম্যঙ্ঘিতুর্যাংশীঃ'—বলেছেন অমরকোষ। স্ফুটজললবস্যন্দিনঃ—স্ফুট—বিন্দু বিন্দু, জললব-জলকণা, স্যন্দিনঃ—স্যন্দন—ক্ষরণ বা বর্ষণ করছে, ঝরে পড়ছে এমন। তন্তুজালাবলম্বাঃ—তন্তু—সূতো অথবা সূক্ষ্ম তার, তাদের জাল অর্থাৎ মালা, সারি, শ্রেণী, এগুলিকে অবলম্বন করেছে অথবা এগুলি থেকে লম্বিত হয়ে ঝুলে পড়েছে এমন। মল্লিনাথ বলেছেন—'বিতানলম্বিসূত্রপুঞ্জাধারাঃ তদগুণগুম্ফিতাঃ' অর্থাৎ চাঁদোয়া থেকে সূতোর মালায় ঝোলানো। চন্দ্রকান্তাঃ—চন্দ্রকান্তমণি (Moonstone), এই মণি থেকে চাঁদের আলোর মতো বর্ণভা বিচ্ছুরিত হয়। এই মণিধারণ সৌভাগ্যপ্রদ বলে জ্যোতিষীদের বিশ্বাস। এই মণি থেকে নাকি বিন্দু বিন্দু জলকণা ক্ষরিত হয়।

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্।

বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বন্ধালাপাঃবহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি।।১০।।

অন্বয় ঃ যত্র অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ বন্ধালাপাঃ কামিনঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈঃ ধনপতিযশঃ উদ্‌গায়দ্ভিঃ কিন্নরৈঃ সার্ধং বৈভ্রাজাখ্যং বহিরুপবনং নির্বিশন্তি।

শব্দার্থ ঃ যত্র—সেখানে (অলকায়), অক্ষয্য-অন্তর্ভবননিধয়ঃ—যাদের ভবন বা গৃহের মধ্যে নিধি বা ধনরত্নসমূহ অক্ষয্য অর্থাৎ অক্ষয় হয়ে থাকে, বিবুধ্বনিতাবারমুখ্যাঃ সহায়াঃ—অপ্সরা রূপ বারবনিতা সহ, বন্ধালাপাঃ—আলাপনরত, কামিনঃ—কামিগণ, প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈঃ—প্রত্যহ মধুরকণ্ঠে, অনুরাগাশ্রিত কণ্ঠে, ধনপতিযশঃ—ধনপতি কুবেরের যশোগান, উদ্‌গায়দ্ভিঃ—উদাত্তকণ্ঠে গাইছে এমন, কিন্নরৈঃ সার্ধং—কিন্নরদের সঙ্গে, বৈভ্রাজাখ্যং—বৈভ্রাজ-আখ্যং—বৈভ্রাজ নামক, বহিরুপবনং—বহিঃ উপবনং—বাইরের উপবনটি, নির্বিশন্তি—উপভোগ করে, বিহার করে।

অন্বয়ার্থ ঃ (বন্ধু!) সেই অলকায় অক্ষয় ধনরত্ন-ভবনের অধিকারী কামী যক্ষগণ প্রত্যহ বারবনিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে মধুর উদাত্তকণ্ঠে ধনপতিকুবেরের যশোগানরত কিন্নরদের সঙ্গে বৈভ্রাজ নামক বাইরের উপবনটি (বিশেষভাবে) উপভোগ করে (অথবা বৈভ্রাজ নামক উপবনে বিহার করে)।১০।।

উজ্জীবনী ঃ অক্ষয্য—ন ক্ষয্য—ক্ষয়ের অযোগ্য (ক্ষয্য—'ক্ষেতুং শক্যঃ' অর্থাৎ ক্ষয়শীল) অতএব অক্ষয্য= অক্ষয় (যার ক্ষয় নাই), অনশ্বর। 'আচারাদ্ ধনমক্ষয্যম্' বলেছেন মনু (মনু. ৪.১৫৬) রামায়ণে অক্ষয় সায়ক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'অক্ষয্যসায়কৌ' (রা.৩.১২.৩৩), মহাভারতে আছে অবিনশ্বর বটবৃক্ষের কথা—'অক্ষয্যকরণো বটঃ' (মহা.৩.৮৭.১১), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রাজা-মহারাজগণের কল্যাণার্থে মুনি-ঋষিদের তপোলব্ধ অক্ষয় পুণ্যফলের এক ষষ্ঠাংশ দানের বিষয় স্মরণ করেছেন মৃগয়ার্থী মহারাজ দুষ্যন্ত; বয়স্য বিদূষককে বলেছেন—'তপঃ ষড়ভাগমক্ষয্যাং দদাত্যারণ্যকা হি নঃ' (অ.শ. ২.১৩)। মল্লিনাথ অক্ষয্যের অর্থ করেছেন—'যথেচ্ছভোগসম্ভাবনার্থম্। বিবুধ্বনিতা—বিবুধ-বনিতা—বিবুধ শব্দের বাচ্যার্থ বিশেষরূপে বুধ অর্থাৎ সুপণ্ডিত বিশেষজ্ঞ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি, ব্যঞ্জিত অর্থে দেবতা। আর বনিতা অর্থে স্ত্রী, অঙ্গনা ইত্যাদি। অতএব বিবুধবনিতা—দেবাঙ্গনা, অপ্সরা, স্বর্গবেশ্যা প্রভৃতি। পরবর্তী শব্দ—বারমুখ্যা—বারযোষিত বা বেশ্যা শব্দটি ব্যবহার করায় এক্ষেত্রে অপ্সরা অর্থ গ্রহণযোগ্য। বারমুখ্যার সমার্থক শব্দ—''বারস্ত্রীগণিকা বেশ্যা রূপাজীবাথ সা জনৈঃ। সৎকৃতা বারমুখ্যা স্যাৎ''—বলেছেন অমরকোষ। উদ্‌গায়দ্ভিঃ—উচ্চৈঃ (উদাত্ত) স্বরে গান করছে এমন। উদাত্তকণ্ঠে সঙ্গীত দেবযোনীদের সাধ্য 'গান্ধার' নামক উদ্‌গান কেবলমাত্র কিন্নরকণ্ঠেই সম্ভব। 'কিন্নরোদগীতভাষিণি'—বলেছেন মহাভারত (মহা.১.১৭২.১০) সঙ্গীতশাস্ত্রে নারদ বলেছেন—''ষড়জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ নতু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ।'' রক্তকণ্ঠৈঃ—রক্ত—মধুর, মিষ্ট, কণ্ঠ-রব যার অর্থাৎ কোকিল। এখানে পদটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থ মধুরস্বরবিশিষ্ট। নির্বিশন্তি—নিঃ(নির্) √ বিশ্ অর্থ উপভোগ, বিহার—'নির্বিশো ভূতিভোগয়োঃ'—বলেছেন অমরকোষ। (এ প্রসঙ্গে দ্র. উজ্জীবনী পূ.মে. শ্লোক— ৬৩)।

৬.২.৮.৪ মেঘদূত (উত্তরমেঘ) কাব্যে ব্যবহৃত সুভাষিত

মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ-এর অন্তর্ভুক্ত সুভাষিতগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় যে সকল কথা বলা হয়েছে সেগুলি উত্তরমেঘ-এর সুভাষিতাবলী সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য। মহাকবি-ব্যবহৃত ঐ সকল সুভাষিত যুগজয়ী হয়েছে কেবল সুভাষিত বলেই নয়, জীবনরসের নিবিড়তা ও প্রাচুর্যের জন্য। প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণ ও মঙ্গলের সমবায় শান্তিসুধারসে পূর্ণ ঐ সকল বাণী। ভাব-ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কয়েকটি সুভাষিতের উল্লেখ এখানে করা হল।—

(১) 'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্'। (উ.মে.১৯) সূর্য বিদায় নিলে পদ্ম তার সৌন্দর্য প্রকাশ করে না।

(২) 'প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা।' (উ.মে. ৩২)—যাদের অন্তঃকরণ কোমল তারা প্রায় সকলেই করুণা পরবশ হয়ে থাকে।

(৩) "কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।।" (উ.মে. ৪৮)—এ সংসারে কেই বা নিয়ত সুখ লাভ করে অথবা একান্ত দুঃখ? মানুষের অবস্থা (দশা) চক্রনেমি বা চক্রধারার মতো কখনো নীচে আবার কখনো বা উপরে নামা-ওঠা করে।

(৪) "স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাৎ ইষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি।' (উ.মে. ৫১)—বিরহে স্নেহরাশি কোনো কারণে ধ্বংস হয়—এরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু (আসলে) এই স্নেহরাশি ভোগের অভাবে অভিলষিত বস্তুতে বর্ধিতরস হয়ে প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।

(৫) 'প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব।' (উ.মে. ৫৩)—কথা বলার চেয়ে কাজের দ্বারা প্রত্যুত্তর দেওয়া মহতের ধর্ম।

৬.২.৮.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাপঞ্জী

১। অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২। অলঙ্কার-চন্দ্রিকা (২য় সং, ভাদ্র-১৩৬৩)—শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

৩। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব (২য় সং ১৩৬৯)—ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য

৪। আনন্দবর্ধন-প্রণীত ধ্বন্যালোক (বঙ্গানুবাদ,১ম সং ১৩৬৪)—শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য

৫। উর্দু প্রেমের কবিতা (১ম সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

৬। উপমা কালিদাসস্য (১ম সং)—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত

৭। ঋগ্বেদসংহিতা (বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৩)—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮। কাব্য-জিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী ১৯৬১)—শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৯। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র), বসুমতী (১০ম সং ১৩৬০)—রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

১০। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ (১ম সং, ১৯৬৫)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১১। কাব্যালোক (৩য় সং, ১৩৭৩)—ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

১২। কাব্যকৌতুক (১লা আশ্বিন, ১৩৬৩)—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

১৩। কালিদাসের কাব্যে ফুল (১ম সং, বুকল্যান্ড, কলিকাতা)—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪। ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৫। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী (১ম সং, ১৯৬২)—ড. দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

১৬। গাহা সত্তসঈ (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

১৭। পারস্য সাহিত্য-পরিক্রমা (১ম সং)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

১৮। পুরাণ প্রবেশ (২য় সং, ১৩৮৫)—গিরীন্দ্রশেখর বসু

১৯। প্রাচীন সাহিত্য (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-১৩৬২)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম ও ২য় খণ্ড)—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী

২১। বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২। বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (১ম সং, ১৩৫৯)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

২৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন

২৪। মেঘদূত পরিচয় (১ম সং, ১৩৭৪)—শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

২৫। মেঘদূত জিজ্ঞাসা (২য় সং, ২০০৫)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২৬। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতসাহিত্য (২য় সং, ২০০০)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

২৭। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (২য় খণ্ড)—নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯

২৮। Aristotle On the Art of Poetry (Oxford University Press-1962) Trs, by Ingram Bywater.

২৯। History of Indian Literature (Vol. 1-3, 1963) M. Winternitz.

৩০। The Meghaduta (1st Ed—Sahitya Akademi, New Delhi, 1957)

৩১। Kalidasa : A Critical study (Bharatiya Vidya Prakashan, 1977)—A. D. Singh

৬.২.৮.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সৌন্দর্যরসবোধের দিক থেকে মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ-এর মধ্যে একটি তৌল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করো।

২। উত্তরমেঘ অবলম্বনে অলকার সৌন্দর্য বর্ণনা করো।

৩। উত্তরমেঘ অবলম্বনে যক্ষভবন ও যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনায় কবির নৈপুণ্যের পরিচয় দাও।

৪। 'উপমা কালিদাসস্য'—কথাটির গুরুত্ব উত্তরমেঘ থেকে কয়েকটি উপমা চয়ন করে ব্যাখ্যা করো।

৫। উত্তরমেঘে যক্ষভবনের পরিচয় দান-প্রসঙ্গে কবির বাস্তুশাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দাও।

৬। 'প্রাচীন সাহিত্যের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে উত্তরমেঘ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবময়, স্বপ্নময়, দিব্য আনন্দরসলোকের কথা বলেছেন তার স্বরূপ বিশদ করো।

৭। উত্তরমেঘ অবলম্বনে মেঘদূত কাব্যের, বিরহভাবনা ব্যাখ্যা করো।

৮। 'সমগ্র মেঘদূত যেন একটি চিত্রশালা।'—উত্তরমেঘ প্রসঙ্গে কথাটির সত্যতা যাচাই করো।

৯। মেঘদূত কাব্য-অবলম্বনে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাজনের গুরুত্ব নির্দেশ করো।

১০। উত্তরমেঘ-অবলম্বনে কালিদাসের সরস জীবনদৃষ্টির পরিচয় দাও।

১১। মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘে ব্যবহৃত সুভাষিতাবলীর কাব্যসৌকর্য বিশ্লেষণ করো।

১২। উত্তরমেঘ এর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য শ্লোকগুলি থেকে বিষয়ভিত্তিক (Textual) প্রশ্ন থাকবে। দৃষ্টান্ত যেমন (ক)—'সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্।'—এই বাক্যের বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে? উদ্ধৃত পংক্তিটির ভাবতাৎপর্য বিশদ করো। (খ) 'মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ।' —উক্তিটির বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা এ কথা বলেছেন? শ্লোকটিতে কথিত ভাবটি বিশ্লেষণ করো।

*অনুরূপভাবে শ্লোক ধরে ধরে প্রশ্ন থাকবে।

———

ষষ্ঠ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ-৩

অভিজ্ঞানশকুন্তলম

একক - ৯

কবি নাট্যকার কালিদাস

বিন্যাসক্রম :

৬.৩.৯.১ : কালিদাস প্রতিভা : কবি-নাট্যকার কালিদাস

৬.৩.৯.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.৯.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.৯.১ : কালিদাস প্রতিভা : কবি-নাট্যকার কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা মহাকবি কালিদাস। 'মহাকবি' এই গুণবাটক শব্দটি তাঁর প্রতিভার মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যদ্যোতক। যিনি মহাকবি—মহৎকাব্য স্রষ্টা, তিনি আবার মহৎ নাট্যরচয়িতাও। কাব্যধর্মের সঙ্গে নাট্যধর্মের এমন সফল-সুন্দর বেণী রচনার উজ্জ্বলতা জগতের খুব বেশি প্রতিভার মধ্যে দেখা যায় না। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম উত্তরকালের জগদ্‌বরেণ্য নাট্যস্রষ্টা শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বড় মাপের সাহিত্যসাধক যাঁরা একাধারে কবি-নাট্যকার ও দার্শনিক।

কিন্তু তাই বলে তাঁকে 'Shakespeare of India' অভিধাভূষিত করলে বিস্মিত হতে হয়। কেননা, তাতে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ কেন্দ্রিত বিরোধ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি এমন সরল সমীকরণে দুই কালের দুই মহাপ্রতিভার মূল্যায়নও অসমীচীন। সেক্ষেত্রে স্থান ও কালগত ব্যবধানের কথা বাদ দিয়েই তাঁদের প্রতিভা কতটা কাছাকাছি তা নির্ণয় করতে হয়। কালিদাস ও শেক্সপীয়র দুজনেই ছিলেন মহৎ সাহিত্য স্রষ্টা। তাঁদের সাহিত্যের জীবন-অন্বেষা দুই মহাদেশের হৃদয়কে ধারণ করে প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্য-কল্যাণ ও মঙ্গলকে আহ্বান করেছে। দুজনেই দুই ভিন্ন মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেই হয়েছিলেন বিশ্বমানবতার বাণীবহ—বিশ্বপথিক। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে 'এহো বাহ্য'।

আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কার কাব্য আর নাটককে একই শ্রেণীভুক্ত করে বলেছে—'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠকাব্য হল নাটক। এই পরস্পর বিরোধী প্রত্যয়টি কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রাচীনকালের সাহিত্যও সংস্কৃতির চর্চা মূলত নাট্য-অবয়ব বা নাট্য-আধারেই বেশি বিকশিত ও প্রাণবন্ত হয়েছিল। একথা কেবল ভারতবর্ষের সাহিত্য সম্পর্কে নয়, ইউরোপের সাহিত্য (বিশেষত গ্রিসীয় সাহিত্য) সম্পর্কেও প্রযোজ্য। দুটি দেশের সাহিত্যেই কাব্যগুণ ও নাট্যগুণ একসঙ্গে মিশ্রিত হয়েই কাব্য অথবা নাটক হয়ে উঠত। মহামতি Aristotle যখন গ্রীক নাটকের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁর সমালোচনা গ্রন্থের নাম দেন 'Poetics', তখন এরূপ শিরোনামের তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আগেই উল্লেখ করেছি, প্রেম-সৌন্দর্য ও কল্যাণদীপ্ত এক সুমঙ্গল জীবনাদর্শের দ্রষ্টা-স্রষ্টা ও উপভোক্তা রূপে কালিদাস বিশ্ববরেণ্য। সুনীতি-সুরুচিসমুজ্জ্বল এক প্রশান্ত জীবনবোধের ভাষ্যকারও ছিলেন তিনি। বস্তুত চিরায়ত সাহিত্যের (Classic Literature) যা কিছু গুণৈশ্বর্য ও মহিমা তা তাঁর সাহিত্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠক-পাঠিকা-দর্শক-শ্রোতার অন্তরে। তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বজনীন রসস্রষ্টা—বিশ্বকবি (Universal Poet or the Poet of the Universe)।

এই সূত্রে কোনো কোনো সমালোচকের মতো কালিদাসকে কেবল যুগন্ধর বা যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক বললে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয় বটে কিন্তু তাতে তাঁর প্রতিভার দেশ-কালোত্তীর্ণ যুগাতিশায়িতার দিকটি যেন অনেকটাই অনাদৃত তথা গৌণ থেকে যায়। কেননা, তাঁর মতো মহৎ ও বিরল প্রতিভাকে কোনো

সংকীর্ণ বৃতি দিয়ে আটকে রাখা যায় না, চলেও না। এই জাতীয় একপেশে সংকীর্ণ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে দেশ-বিদেশের সাহিত্যরসিক সমালোচকদের কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্যের উল্লেখই যথেষ্ট।

'হরিহরাবলী'তে প্রাচীন কবির্মনীষীদের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে একমাত্র কালিদাসকে 'প্রকৃত কবি' আখ্যায় ভূষিত করে বলা হয়েছে—

"পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে
কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতঃ কালিদাসঃ।
অদ্যাপি তত্তুল্য কবেরভাবাৎ
অনামিকা সার্থবতী বভুব।।"

অর্থাৎ পুরাকালে কবিদের সংখ্যা গণনা প্রসঙ্গে কালিদাসই কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে বা প্রথমস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তারপর আজ পর্যন্ত তাঁর মতো কবি প্রতিভার অভাবে দ্বিতীয় অঙ্গুলির 'অনামিকা' অর্থাৎ নামহীনা—এই শিরোনামটিকে সার্থকই বলতে হবে। (অর্থাৎ প্রকৃত 'কবি' বলতে তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ।)

মহাকবি বাণভট্ট থেকে শুরু করে কবি জয়দেব, শ্রীমধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবৃন্দ কালিদাস-প্রশস্তিতে মুখর। জয়দেবের দৃষ্টিতে তিনি 'কবিকুলগুরু' এবং 'বিলাসকলার' কবি, মধুসূদনের কাছে তিনি 'পিককুলপতি' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বোধে তিনি ছিলেন 'চিরকালের কবি—'কবিপতি'। সর্বপল্লী ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁকে গ্রহণ করেছেন ভারতাত্মার প্রতীক—'ভারতপথিক' রূপে।

কেবল প্রাচ্যদেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সারস্বত প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতিধন্য হয়েছেন কালিদাস। প্রাচ্য বিদ্যার্ণব সার উইলিয়াম জোন্স-কর্তৃক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর কিয়দংশের জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ (১৭৮৯ খ্রিঃ) ও ১৮১৩ সালে হোরেস হেম্যান উইলসন-কর্তৃক 'মেঘদূতম্'-এর ইংরেজী কাব্যানুবাদ মহাকবি কালিদাসকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় জনপ্রিয় করে তোলে। অতঃপর কালিদাসীয় সাহিত্যে সমুজ্জ্বল ভারতীয় রসলোকের সন্ধানে বিস্ময়বিমূঢ় অনেক বিদগ্ধ কবি-দার্শনিক-সমালোচক প্রাচ্য সাহিত্যের অমৃতরসলোকে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন, মুখর হয়েছেন কালিদাস প্রশস্তিতে। হ্যামবলডট্, গ্যায়টে, ড. রাইডার, ড. সিলভ্যাঁ লেভি. মনিয়ের উইলিয়মস, ম্যাক্সমূলার, কীথ, উইনটারনিৎসজ, ওয়েবার, অধ্যাপক ল্যাসেন, রোমাঁ রল্যাঁ প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কালিদাসের রচনাবলী :

মহাকবি কালিদাসের রচনাবলীরূপে চিহ্নিত, অবিতর্কিত ও সর্বজনস্বীকৃত গ্রন্থের সংখ্যা মূলত সাত। এদের মধ্যে কাব্য চারখানি এবং বাকি তিনখানি নাটক। কাব্যগুলি যথাক্রমে 'ঋতুসংহার',

'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশ' এবং নাটক তিনটি যথাক্রমে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশীয়' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম সৃষ্টি। এই একটিমাত্র নাট্যসৃষ্টি থেকেই তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। তাই বোধ করি সমালোচক আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—

"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রৈবাপি চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা।।"

বস্তুত তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের শ্রেষ্ঠাংশও ঐ চতুর্থ অঙ্ক যার মূল প্রতিপাদ্য দুষ্যন্ত-পরিণীতা আপন্নসত্ত্বা শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালীন বিদায়দৃশ্যের সংবেদনশীল আলেখ্য উপস্থাপনা। পাঠ্যসূচীতে গৃহীত নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট অধ্যায়টির বিচার বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় বিবেচ্য।

প্রশ্ন জাগে, কোন্ গুণৈশ্বর্যে কালিদাসের এই নাটকটি বিশ্বের বিবেকবান ও সহৃদয় সামাজিকদের মনে সাড়া জাগায়? উত্তরে বলা যায়, মহাকবির ভাবপ্রকাশের উপযোগী বিশিষ্ট রচনাশৈলী ও তাঁর অনুধ্যেয় আদর্শায়িত জীবনবোধ নাটকটিকে কালজয়ী সৃষ্টির মহিমা দান করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য শৈলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠরীতি 'বৈদর্ভী'র যাবতীয় গুণ—শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা-মাধুর্য-সৌকুমার্য-সুগভীর অর্থদ্যোতনা-ঔদার্য্য-ওজোগুণ-কান্তি প্রভৃতির অত্যুজ্জ্বল প্রাকশে ঋদ্ধ হয়েছে তাঁর নাট্যভাষা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবি-নাট্যকারের সুমার্জিত সুরুচি-সুশুচিসমুজ্জ্বল আদর্শায়িত অখণ্ড জীবনবোধ। তাঁর সাহিত্যের অন্যতম ভূষণ প্রকৃতিপ্রাণতা। নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিখিল মানবমনকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়ার অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর। তপোবন-আশ্রিত ভারতীয় জীবনচিকীর্ষার জীবন্ত চিত্রাবলী উপহার দিয়েছেন তিনি। কখনো ছোটো ছোটো বাক্যের স্ফটিকঘন সৌকর্য, কখনো বা আবেগদীর্ণ সংবেদনশীল সুদীর্ঘ নাট্যসংলাপের গভীরতা অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকটিকে অক্ষরার্থদীপ্ত অথচ অভিপ্রেত ভাব-ব্যঞ্জনায় পূর্ণ ও বোধির আলোকে বিভাসিত এক বিরল নাট্যসৃষ্টির মহিমা দান করেছে। অসমান্য বীক্ষণশক্তি, পরিমিতিবোধ, সংকেতময়তা ও সৌন্দর্যরসবোধ কালিদাসের সাহিত্যকে একটি শিষ্টমাত্রা দান করেছে। জীবন-অন্বেষার সুসূক্ষ্ম বুনোটে মানবিক অনুভূতির স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটককে করে তুলেছে জগতের অন্যতম বরেণ্য নাটক।

কালিদাসের কাল :

কালিদাসের সাহিত্যরসমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছিলেন—

"হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"

সকল বিচার-বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল কবিকে নিয়ে নয়, বরং তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যরসেই আকণ্ঠ তৃপ্ত

থাকবার বাসনা প্রকাশ করে উত্তমর্ণ কবির ঐশ্বর্য-গৌরবময় ভাবজগতের রহস্যাবৃত কল্পলোকে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন—

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে।।"

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, একালের আধুনিক গীতিকবির নবরত্নের মালায় 'দশম রত্ন' হয়ে ফুটে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা কি নিতান্তই বায়বীয় আবেগপ্রসূত, নাকি এক বিশেষকালের বিশেষ কবির মানস-বিকাশের পরিপ্রেক্ষা-আশ্রিত? রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি যাই হোক না কেন, মহাকবি কালিদাস কোন্ বিশেষ যুগের সৃষ্টি এবং কোন্ সাহিত্যানুরাগী নরপতি ও রাজসভা তাঁর মতো অমূল্য রত্নকে ধারণ করে ধন্য হয়েছিল এ নিয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। সুতরাং কালিদাস ও তাঁর আবির্ভাবকাল, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহে পণ্ডিতকুল বিচিত্রমুখী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের সেইসকল পরস্পরবিরোধী মতবাদের সরল সমীকরণ প্রায় অসম্ভব। তাই পণ্ডিতবর্গের কূটযুক্তি ও তর্কজালের নিবিড় অরণ্যে পথ না হারিয়ে কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাস্য রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে।—

(১) পণ্ডিত হিপ্পোলিতে ফৌস (Dr. Hippolite Fauche)-এর মতে কালিদাস খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকের কবি এবং রঘুবংশীয় নরপতি অগ্নিবর্ণের সমসাময়িক।

(২) ড. সি. কানহন্ (Dr. C. Kunhan), সারদারঞ্জন রায়, কুমুদরঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ কালিদাসকে শুঙ্গবংশীয় নরপতি অগ্নিমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কবি বলে মনে করেন।

(৩) উইলিয়াম জোনস্, সি. এস. পাণ্ডে, বি. ডি. উপাধ্যায়, এম. আর কালে, আর. এন. আপ্তে, আর. ডি. কর্মকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জি. এস. হীরাচাঁদ ওঝা, কে. পি. মিত্র, ড. রাজবলী পাণ্ডে প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী কালিদাসকে খ্রি.পূ. প্রথম শতকের কবি বলে মনে করেন। এঁরা সকলেই পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য সহযোগে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কালিদাস কিংবদন্তিখ্যাত উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ নরপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ-সভাকবি। বিক্রমাদিত্য খ্রি.পূ. ৫৭ অব্দে শকদের পরাজিত করেন এবং স্বনামে 'বিক্রংসংবৎসর' চালু করেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাস সম্মত নয়।

(৪) অধ্যাপক ল্যাসেন ও ওয়েবারের বিশ্বাস, কালিদাস ছিলেন খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক।

(৫) ড. এ. বি. কীথ মনে করেন, কালিদাস খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের কোনো সময়ে হূন-বিজেতা ইতিহাসখ্যাত উজ্জয়িনীর রাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য'র রাজত্বকালে (খ্রি. ৩৮০-৪১৩) আবির্ভূত হন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র কুমারগুপ্তের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। এই দুই নরপতির পৃষ্ঠপোষকতায় কালিদাস-প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে। ড. ব্যুলার, স্মিথ, ম্যাকডোন্যাল, ড. ডি. সি.

সরকার, উইনটারনিৎসজ্, স্টেনকণৌ, লাইবিস, টি. ব্লঁস, পণ্ডিত রামাবতার শর্মাচার্য প্রমুখ সাহিত্যাচার্যগণের অনেকেই এমতের সমর্থক। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট এই মতই এতাবৎকাল পর্যন্ত কালিদাসের আবির্ভাবকালরূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

(৬) ড. ফার্গুসন কালিদাসের জীবৎকালকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী। ড. হোর্ণলি, ভউ দাজী (Bhau Daji), কার্ণ, ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর, কে. বি. পাঠক প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই মতের সমর্থক। অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাকডোন্যাল কালিদাসকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কবি বলে মনে করেন।

যাইহোক, কালিদাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সাধারণভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত হল এই যে, কালিদাস গুপ্ত যুগের খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর কবি এবং খুব সম্ভবতঃ কিংবদন্তির জনপ্রিয় মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই (খ্রি. ৩৮০-৪১৩) ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের ছায়া ও হূনবিজয়ের উল্লেখ, 'মালাবিকাগ্নিমিত্রে' পূর্বসূরী অথবা সমসাময়িক দার্শনিক-মনীষী ধাবক, সৌমিল্লক, কবিপুত্র প্রভৃতির উল্লেখ, বৎসভট্টির দশপুর প্রত্নলেখে' (৪৭৩ খ্রি.) কালিদাসীয় রচনাশৈলীর অনুসরণ ও কুমারগুপ্তের জন্মোৎসবের ছায়ায় 'কুমারসম্ভব' রচনা, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রস্তরলিপিতে (Ihole Inscription) যশস্বী কবিদের নামের সঙ্গে কালিদাসের নামোল্লেখ এবং বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' (খ্রি. সপ্তম শতাব্দী) কালিদাস-প্রবর্তিত বৈদর্ভী রীতির অনুসরণ প্রভৃতি থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে কালিদাস গুপ্ত যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা।

গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। জ্ঞানে-গরিমায়, ঐশ্বর্যে-ভাস্কর্যে-স্থাপত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসন-শৃঙ্খলায়, শৌর্যে-বীর্যে-মন্ত্রণায়, সর্বোপরি দর্শন-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় প্রদীপ্ত গুপ্তযুগ—ভারতবর্ষের গৌরবময় স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপুষ্ট হিন্দু সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষের পরিচয়ে ভাস্বর এই যুগ কালিদাসের রসচিকীর্ষার পথকে উজ্জীবিত ও প্রশস্ত করেছিল। "একটা পরম ঐশ্বর্যময়, জীবনবাদীও সম্পন্নকালের পটভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বলেই তাঁর সাহিত্যে জীবনরসের নিবিড়তা আমাদের এমন করে টানে।" ('মেঘদূত-জিজ্ঞাসা'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)।

একক - ১০

নাটকের কুশীলব (চরিত্র)

বিন্যাসক্রম

৬.৩.১০.১ নাটকের কুশীলব (চরিত্র)

৬.৩.১০.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১০.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.১০.১ : অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কুশীলব (নাট্য-চরিত্র) :

চরিত্র পরিচয়—পুরুষ চরিত্র :

দুষ্যন্ত—হস্তিনাপুরের মহারাজা

মাধব্য—বিদূষক (রাজমনোরঞ্জক বয়স্য)

সর্বদমন (ভরত)—দুষ্যন্ত-শকুন্তলার শিশুপুত্র

সোমরাত—রাজপুরোহিত

সূত—রাজসারথি

বাতায়ন—কঞ্চুকী

রৈবতক—দ্বাররক্ষক

শ্যাল—নগরপাল

জানুক ও সূচক (জানুঅ ও সূঅঅ) —নগররক্ষীদ্বয়

ভদ্রসেন—রাজসেনাপতি

করভক—রাজমাতার দূত

বৈতালিকদ্বয়

ভগবান কাশ্যপ—মহর্ষি কণ্ব, আশ্রমপ্রধান ও শকুন্তলার পালক-পিতা।

শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গালব্য বৈখানস, গৌতম, নারদ—মহর্ষি কাশ্যপের শিষ্যবৃন্দ

মারীচ—দেবর্ষি, দেবতা ও দানবদের পিতা

সূত্রধার—নাট্য পরিচালক

স্ত্রীচরিত্র :

শকুন্তলা—বিশ্বামিত্র-মেনকার কন্যা, মহর্ষি কাশ্যপ-পালিতা, নাটকের নায়িকা চরিত্র।

অনসূয়া—প্রিয়ংবদা—শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী।

গৌতমী—মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমের প্রধানা তপস্বিনী

অদিতি—মহর্ষি মারীচের পত্নী, দেব ও দানবদের মাতা

সানুমতী—শকুন্তলার বান্ধবী, অপ্সরা

পরভৃতিকা ও মধুরিকা—মহারাজা দুষ্যন্তের উদ্যান-পালিকাদ্বয়

চতুরিকা—রাজপরিচারিকা

প্রতিহারী—দ্বাররক্ষিকা

নটী—সূত্রধারপত্নী

যবনী—রাজসেবিকা

পরোক্ষ চরিত্র (স্ত্রী ও পুরুষ) :

পৌলোমী—দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী

মেনকা—অপ্সরা, শকুন্তলার মাতা

বসুমতী—দুষ্যন্তের জননী

হংসপদিকা—দুষ্যন্তপত্নী

ইন্দ্র—দেবরাজ

জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র

কৌশিক—ঋষি বিশ্বামিত্র, শকুন্তলার পিতা

নারদ—কাশ্যপশিষ্য

দুর্বাসা—বিশিষ্ট ঋষি যিনি স্বভাবতই অন্যের প্রতি কোপপরায়ণ

মার্কণ্ডেয়—ঋষিপুত্র, দুষ্মন্ততনয় সর্বদমনের খেলার সঙ্গী

বৃদ্ধশাকল্য—মারীচাশ্রমের বৃদ্ধতপস্বী

পিশুন—কোষাধ্যক্ষ ও প্রধানমন্ত্রী

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে ৪৭টি চরিত্রের সমবায়ে রচিত সুবৃহৎ একটি সপ্তাঙ্ক নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

একক - ১১

নাটকের বিষয়সংক্ষেপ

বিন্যাসক্রম

৬.৩.১১.১ অভিজ্ঞান শকুন্তলার নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

৬.৩.১১.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১১.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.১১.১ : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের বিষয়-সংক্ষেপ

নাট্য উপস্থাপনার সূচনাতে আদিনট, অষ্টমূর্তিরূপে প্রকাশিত ভগবান শিবের প্রশস্তিসূচক নান্দীপাঠ। তারপর মঞ্চে সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ—'নান্দ্যতে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ।' সূত্রধার ও নটীর আলাপচারিতা থেকে জানা গেল যে সময়টা গ্রীষ্ম এবং ঐকালের পটভূমিকায় রচিত মহাকবি কালিদাসের নবনাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র অভিনয় হতে চলেছে। এরপর প্রথমাঙ্কের বিষয়।

মহারাজা দুষ্যন্ত রথারোহণ করে মৃগয়াযাত্রা করেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সারথি ও বিনোদক বয়স্য প্রিয় বিদূষক মাধব্য। একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে অজ্ঞাতসারে কখন যে তিনি গভীর অরণ্য ছেড়ে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে প্রবেশ করেছেন বুঝতেই পারেন নি। তাঁর হুঁশ হল অচিরেই। ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শিকারটির উপরে তিনি বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত এমন সময়ে শুনতে পেলেন ঋষিকণ্ঠের কাতর মিনতি—"ভো ভো রাজন্! আশ্রমমৃগোহয়ম্ ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।"—মহারাজ, এ আশ্রমমৃগ, অবধ্য।' শায়ক সম্বরণ করে তিনি রথ থেকে নেমে মহর্ষি কাশ্যপ (কণ্ব) ও আশ্রমের আশ্রিতদের

সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন। তাপসদের অনুরোধে আতিথ্য গ্রহণ করে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলেছেন, দেখলেন তিনটি সমবয়সী তরুণী সহকার বৃক্ষের আলবালে জল সেচনরত। তাঁদের মধ্যে রূপে-গুণে অতুলনীয়া তরুণীটিকে দেখামাত্রই তাঁর দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হতে লাগল। সখীদের আলাপচারিতা থেকে তিনি বুঝলেন যে তার নাম শকুন্তলা। আরও জানলেন, শকুন্তলা আশ্রমের প্রাণস্বরূপা এবং তারই উপর আশ্রমের সর্বপ্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত করে মহর্ষি বর্তমানে আশ্রমের বাইরে সোমতীর্থে।

ইতিমধ্যে একটা দুষ্ট ভ্রমর বারবার শকুন্তলাকে উত্যক্ত করতে থাকলে সখীরা ঠাট্টা করে তাঁকে বলে, 'এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য কি আর করবে, রাজা দুষ্যন্তকে ডাকো।' সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ সন্ধানী দুষ্যন্তের আত্মপ্রকাশ এবং চারিচক্ষুর মিলন। প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়বন্ধন পরস্পরকে আরও অন্তরঙ্গভাবে জানার অবকাশ রচনা করে। প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি এখানেই।

দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় বিদূষক ও দুষ্যন্তের ভাব-বিনিময়। মহারাজের বর্তমান ভাব-গতিক লক্ষ্য করে বিদূষকের কটাক্ষ, মহারাজ বুঝি তপোবনকে প্রমোদকানন করে তুলতে চান। দুষ্যন্ত সংগোপনে তার কাছে শকুন্তলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও দুর্বলতার বিষয় স্বীকার করেন। শকুন্তলার চিন্তায় আচ্ছন্ন মহারাজা ভাবছেন কেমন করে কোন অছিলায় তাকে আর একবার দেখতে পাবেন, এমন সময়ে ঋষিকুমারদ্বয় তাঁর কাছে এসে জানাল যে রাক্ষসেরা যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। তারা শরণাগত এবং তাঁর সাহায্যপ্রার্থী। অগত্যা বিঘ্ননাশকল্পে কয়েকদিনের জন্য তিনি আশ্রমের আতিথ্য স্বীকার করলেন। কিন্তু বিপত্তি হল। রাজধানী থেকে দূতের মাধ্যমে খবর এসেছে। রাজমাতা আসন্ন পুত্রেষ্টি যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে সত্বর মৃগয়াভূমি থেকে রাজধানীতে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছেন। দ্বিধায় পড়লেন মহারাজ। একদিকে অলঙ্ঘ্য মাতৃ আদেশ, অন্যদিকে শকুন্তলার আকর্ষণ ও রাক্ষসদলনরূপ পুণ্যকর্ম। কোন দিক রক্ষা করবেন তিনি। সমাধানের সূত্রও খুঁজে পেলেন তিনিই। বিদূষককে যে রাজমাতা পুত্রতুল্য মনে করেন। সুতরাং পুত্রের কাজ পুত্রতুল্য বিদূষককে দিয়ে করিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে তিনি তাঁকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদায়ের আগে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, শকুন্তলার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা যেন কারো কাছে না প্রকাশ করে ফেলে। কেননা ব্যাপারটা তো সত্য নয়, কল্পনা মাত্র! পরিহাসচ্ছলেই তিনি তাকে শকুন্তলাতত্ত্ব বলেছেন—'পরিহাস বিজল্পিতম্।' (২য় অঙ্ক)।

রাক্ষস দলন তো হল। শকুন্তলাকে দেখবার জন্য আকুল হলেন দুষ্যন্ত। শকুন্তলার অবস্থাও ততোধিক। লতাকুঞ্জের দিকে এগিয়ে গেলেন দুষ্যন্ত। শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠের কাতরতা। অসুস্থা শকুন্তলাকে নিয়ে বিব্রতা অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কী করে যে প্রিয়সখীকে সুস্থ করে তুলবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। অগত্যা অকপটে শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রতি তার গভীর অনুরাগের কথা বলে ফেললেন—'সখি! যবে থেকে তপোবনের রক্ষক সেই রাজর্ষিকে দেখেছি....।' সখীদ্বয় সবই বুঝলেন। প্রিয়সখীর গভীর অনুরাগের কথা মহারাজের কাছে গোপনে পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা করলেন তাঁরা।

স্থির হল, শকুন্তলা নলিনীপত্রে প্রণয়পত্র রচনা করবেন আর তা ফুলের মধ্যে লুকিয়ে 'নির্মাল্য' বলে মহারাজের কাছে পৌঁছে দেবেন তাঁরা। শকুন্তলা মনে মনে কল্পনা করছেন পত্রে লিখবেন এই কথা—"ওগো নির্দয়! তোমার হৃদয়ের কথা আমি জানি নাচ কিন্তু তোমার অনুরাগী আমার অঙ্গগুলিকে প্রেমের দেবতা কামদেব যে নিরন্তর (দিবা-রাত্র) তাপিত করছেন।"—

(তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবা বি রত্তিম্পি

নিগ্‌ঘিণ তবই বলীঅং তুহ বুত্ত মণোরহাইং অঙ্গাইং।।)

শকুন্তলাসহ সখীদের বৃত্তান্ত অন্তরালে থাকা দুষ্যন্তের গোচরে আসা মাত্রই স্বয়ং সশরীরে তাঁদের সামনে হাজির হলেন তিনি। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের তাৎপর্য বুঝে সখীদ্বয় একটি মগশাবক কে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার অছিলায় লতাকুঞ্জ থেকে বাইরে গেলেন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন হল। অদূরে মা গৌতমীর কণ্ঠস্বর শুনে রাজা লতাকুঞ্জের আড়ালে আত্মগোপন করলেন। তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি এখানে।

গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করলেন দুষ্যন্ত। যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে তাঁকে অচিরকালের মধ্যেই রাজধানীতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তপোবন ছেড়ে গেলেন। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধুর মিলনবৃত্তান্ত অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া আশ্রমের আর সকলের অগোচরেই রইল। আপন্নসত্ত্বা শকুন্তলাকে নিয়ে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চিন্তার শেষ নেই। প্রতিশ্রুতিমতো প্রিয়সখীকে নিয়ে যাবার জন্য রাজধানী থেকে মহারাজের কোনো দূত এলেন না। পতিচিন্তায় আত্মসমাহিতা শকুন্তলা। এদিকে মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলার রিষ্টিদোষ মুক্তির জন্য গিয়েছেন আশ্রমের বাইরে—সোমতীর্থে তপঃসাধনের উদ্দেশ্যে। আশ্রম পরিচালনার গুরুভার তিনি অর্পণ করে গেছেন পরম স্নেহাপদা শকুন্তলার উপর। ইতোমধ্যে ঋষি দুর্বাসা আশ্রমের প্রবেশদ্বারে এসে 'অয়মহং ভোঃ' ঘোষণা করে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর উপস্থিতি। পতিগতপ্রাণা শকুন্তলার বেহুঁশ চেতনায় দুর্বাসার আবেদন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। ক্ষুব্ধ-রুষ্ট দুর্বাসা 'আ অতিথিপরিভাবিনি! ...' ইত্যাদি বলে কঠোর অভিশাপ দিলেন তাঁকে। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে অভিশাপ তিনি তো আর নিজের মধ্যে নেই! দুর্বাসা-কেন্দ্রিত দুর্ভাবনা তাঁকে স্পর্শ করতেও পারল না। ঋষি কণ্ঠের আওয়াজ অনসূয়া-প্রিয়ংবদার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে আসন্ন দুর্বিপাক থেকে মুক্তিসূত্রের খোঁজ মিলল। স্বভাবরুষ্ট মহর্ষি শেষ পর্যন্ত ক্ষমার সুরে 'কোনো অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে তাঁর শাপ ফলবে না'—একথা বলতে বলতে দ্রুত চলে গেলেন। দুই প্রিয়সখী যে ঘটনার সাক্ষী শকুন্তলা তার কিছুই জানলেন না।

মহর্ষি কাশ্যপ আশ্রমে ফিরেছেন। শকুন্তলা-দুষ্যন্ত উপাখ্যান তাঁর ধারণারও বাইরে। এই বৃত্তান্ত যখন তিনি জানবেন, না জানি তিনি কিরূপ আচরণ করবেন। এ সকল ভেবে শঙ্কাতুর হয়ে পড়েছে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। এদিকে আকাশবাণীতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় থেকে পরিণয় কথা জেনেছেন মহর্ষি। তিনি রুষ্ট তো হনই নি, বরং এই শুভ ঘটনায় আনন্দিত হয়ে আশ্রমে ফিরেই শকুন্তলাকে পতিগৃহে

পাঠাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। পিতার আচরণে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যারপরনাই খুশি। পুণ্যস্নানে পবিত্রগাত্রী শকুন্তলাকে দৈশিক অলঙ্কার-আভরণে ফুলসাজে সাজিয়ে দেবার ভার পড়ল সখীদ্বয়ের উপর। যজ্ঞীয় পূতাগ্নি ও বেদী প্রদক্ষিণ শেষে আশীর্বাদপর্ব। এক তপস্বিনী আশীর্বাদ করে বললেন, 'বাছা, তুমি পতির কাছে বহুসম্মানের পাত্রী হও।' ('বচ্ছে! ভর্তুর্বহুমতা ভব।') অপর তপস্বিনী আশীর্বাদ করলেন, 'বাছা, বীর সন্তানের জননী হও। ('বচ্ছে, বীরপ্পসবিণী হোহি।')

এবার পতিগৃহগামিনী শকুন্তলাকে কেন্দ্র করে যাত্রা পর্ব। মহর্ষি কণ্বের (কাশ্যপ) নির্দেশে মা গৌতমী, সার্ঙ্গরব, শারদ্বত শকুন্তলাকে মধ্যমণি করে অগ্রসর হবেন। তপোবনলালিতা শকুন্তলা তপোবন প্রকৃতির কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছেন। বনজ্যোৎস্না বনতোষিণী নবমল্লিকার সহকার আলিঙ্গন ও পল্লবিত হয়ে ওঠার আনন্দে তিনি আত্মহারা। সন্তান তুল্য মাতৃহারা হরিণ শিশুটি তাঁর আঁচল ধরে টানলে তাকে প্রবোধ দেন। মহর্ষি তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হলে পরম মমতায় তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করেন। শেষ বিদায়ের আগে পতিগৃহে গুরুজন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের প্রতি বধূ শকুন্তলার ব্যবহার কেমন হবে সে সম্পর্কে তাঁকে উপদেশ দিলেন মহর্ষি। তারপর বনরাজির আড়ালে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলে অশ্রুপ্লুতা অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর মনে হল, কন্যা যেন পরের ঘরে গচ্ছিত ধন। আজ তাঁকে পতিগৃহে পাঠিয়ে তিনি যেন পরম তৃপ্তি অনুভব করছেন। চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু এই।

শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে শার্ঙ্গরব-শারদ্বত ও গৌতমী দুষ্যন্তর রাজধানী হস্তিনাপুরে উপস্থিত। মহারাজা দুষ্যন্তের কাছে নিবেদন করা হল, তাঁর বিবাহিতা পত্নী শকুন্তলাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করা হোক। আকস্মিক অদ্ভুত আবেদনে বিস্মিত দুষ্যন্ত পূর্বকথা কিছুই মনে আনতে পারলেন না। শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হলেন। শুরু হল তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। মহারাজা বিবাহের প্রমাণ চাইলে শারদ্বত ক্ষুব্ধ হলেন। শকুন্তলার মনে পড়ল সখীদের সাবধান বাণী। সখীরা বলেছিলেন অনুরূপ ক্ষেত্রে মহারাজদত্ত আংটিটি সে যেন দেখায়। কিন্তু কোথায় আংটি! অসহায়া শকুন্তলার প্রতি মহারাজের বিদ্রূপ তীব্রতর হলে ক্ষোভে দুঃখে-লজ্জায় অপমানাহত শকুন্তলা পুরানো দিনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের স্মৃতিচারণা করলেন যদি মহারাজ তাঁকে চিনতে পেরে গ্রহণ করেন এই আশায়। কিন্তু তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ হল। হতাশ শারদ্বত গুরুর আদেশে শকুন্তলাকে মহারাজের কাছে রেখে অগত্যা আশ্রমে ফিরে যেতে চাইলেন।

এদিকে রাজগণৎকারগণ জানিয়েছেন যে মহারাজ পুত্রসন্তান লাভ করবেন এবং তাঁর শরীরে রাজচক্রবর্তীর চিহ্নসমূহ থাকবে। বিচলিত মহারাজ ও শকুন্তলাকে বর্তমান দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন রাজপুরোহিত। স্থির হল, যতদিন পর্যন্ত না শকুন্তলার সন্তান জন্মলাভ করে ততদিন তিনি রাজপুরোহিতের আশ্রয়েই থাকবেন। সন্তান যদি রাজচক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত হয় তবেই প্রমাণ হবে যে শকুন্তলা মহারাজের পরিণীতা। এই ব্যবস্থায় দুষ্যন্ত সম্মতি জানালেন।

অশ্রুভারনত শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন রাজপুরোহিত। হঠাৎ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি

এসে শকুন্তলাকে মহাশূন্যে নিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হলেন। ঘটনাটি দুষ্যন্তের কাছে নিবেদিত হলে এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। (পঞ্চম অঙ্ক)।

ষষ্ঠ অঙ্কের সূচনায় অন্য দৃশ্য। রাজরক্ষিগণ একটা জেলেকে ধরেছে মহারাজের নামাঙ্কিত আংটিটি নাকি সেই চুরি করেছে। এদিকে জেলে বলছে, মাছ কাটতে গিয়ে একটি মাছের পেট থেকে সে নাকি রত্নভাস্বর বহুমূল্য ঐ আংটি পেয়েছে। বিচারের আশায় সেই ধীবরকে সঙ্গে নিয়ে রক্ষিগণ রাজার কাছে এলে অঙ্গুরীয়ক দেখেই শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পরিণয়ের সকল কথা মনে পড়ে গেল। অনুতপ্ত বিষদাচ্ছন্ন ও অপুত্রক দুষ্যন্তকে সান্ত্বনা দিলেন স্বর্গ থেকে দেবরাজপ্রেরিত সারথি মাতলি। জানা গেল, দানবদলনের জন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র দুষ্যন্তের সাহায্য চেয়ে মাতলিকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন। দুষ্যন্ত তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। (ষষ্ঠ অঙ্ক)

ইন্দ্রশত্রু দানবদের পরাজিত করে স্বর্গ থেকে আকাশপথে মর্ত্যে ফিরছেন দুষ্যন্ত। মাতলির কাছ থেকে শুনলেন, অদূরবর্তী হেমকূট পর্বতে মহর্ষি মারীচের আশ্রম। ইন্দ্রের জনক-জননী ঋষি মারীচ ও অদিতিকে বন্দনা করে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর আগমন সংবাদ মহর্ষির কাছে পৌঁছে দিলেন মাতলি। আশ্রমে প্রবেশ করতেই একটি বিরলদৃশ্য দুষ্যন্তকে বিস্মিত ও পুলকিত করল। তিনি দেখলেন, একটি বালক সিংহশিশুর কেশ আকর্ষণ করতে করতে খেলা করছে। তাকে দেখেই স্নেহে পূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর হৃদয়। সঙ্গিনীদের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে ছেলেটির পিতা পুরুবংশীয় এবং তার জননীর নাম শকুন্তলা। শুনেই চকিত হলেন তিনি। এমন সময়ে ছেলেটির হাত থেকে রক্ষাকবচ খুলে পড়ে গেছে মাটিতে। মহারাজা সঙ্গে সঙ্গে সেটি মাটি থেকে তুলে নিতেই বিস্মিত তপস্বিনীরা বুঝে গেলেন যে মহারাজই ছেলেটির পিতা। কেননা তার পিতা ছাড়া অন্য কেউ সেটি ছুঁলেই তা সাপ হয়ে তাকে দংশন করবে। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা তাপসীরা জানালেন শকুন্তলাকে। ছুটে এলেন শকুন্তলা। সুদীর্ঘ বিরহে অনুতপ্ত দুষ্যন্ত তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বেদনার ভার বিগলিত মঙ্গলমিলনে মধুর হয়ে উঠল। সেই পবিত্র মিলনের বার্তা অচিরেই পৌঁছে দেওয়া হল মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের এখানেই সমাপ্তি। (সপ্তম অঙ্ক)

একক - ১২

চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব

বিন্যাসক্রম

৬.৩.১২.১ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বাংলা রূপান্তর

৬.৩.১২.২ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কাশ্রিত রসাগ্রাহী বিশ্লেষণ

৬.৩.১২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৩.১২.১ : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বাংলা রূপান্তর ১

(তারপর পুষ্পচয়ন-অভিনয়রত দুই সখীর প্রবেশ)

অনসূয়া — ওলো প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্বমতে শুভ বিবাহের দ্বারা শকুন্তলা উপযুক্ত পতি লাভ করেছে বলে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত, তাহলেও একটা চিন্তা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

প্রিয়ংবদা — কেন রে? কিসের চিন্তা?

অনসূয়া — পুণ্য কাজটি শেষ করে ঋষিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই রাজর্ষি নিজের রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন। এখন অন্তঃপুরে গিয়ে এখানকার সকল ঘটনা তিনি মনে করতে পারছেন কি না—এইটেই চিন্তার বিষয়।

প্রিয়ংবদা — এ বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত হতে পারিস। আমার বিশ্বাস, তাঁর মতো সুপুরষ কখনো গুণহীন হতে পারেন না। তবে পিতা (মহর্ষি কণ্ব) এখন এই ঘটনার কথা শুনে ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবেন কে জানে।

অনসূয়া — আমার মন কি বলছে জানিস? পিতা বোধহয় ব্যাপারটা মেনে নেবেন।

প্রিয়ংবদা — কী করে একথা বলতে পারিস?

অনসূয়া — ভেবে দ্যাখ, গুরুজনদের প্রধান সংকল্প হল গুণবতী কন্যাকে সুপাত্রে দান করা। এখন সেই ব্যাপারটি যদি দৈবই ঘটিয়ে দেয় তাহলে বিনা চেষ্টাতেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন।

প্রিয়ংবদা — যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই। (সাজি দেখে) সখি! পূজার জন্যে যথেষ্ট ফুল তোলা হয়েছে।

অনসূয়া — তাই তো! প্রিয়সখী শকুন্তলার সৌভাগ্য দেবতার অর্চনা করতে হবে না?

প্রিয়ংবদা — অবশ্যই। (অভিনয় করে দেখালেন।)

(নেপথ্যে—অয়মহং ভোঃ—এই যে আমি এসেছি।)

অনসূয়া — (কান পেতে) সখি! কোনো অতিথি এসে কিছু বলছেন মনে হচ্ছে!

প্রিয়ংবদা — চিন্তা নেই, কুটীরে শকুন্তলা আছে না! (মনে মনে) কিন্তু আজ ওর মন কি আর ওতে আছে!

অনসূয়া — থাক, আর ফুল তুলে কাজ নেই। এইই যথেষ্ট।

(নেপথ্যে) ওরে আতিথ্যধর্মভ্রষ্টা! একমনে যার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মতো তপস্বীর উপস্থিতিও তোর চোখে পড়ল না, (আমি অভিশাপ দিচ্ছি) সে তোকে কিছুতেই চিনতে পারবে না, বারবার মনে করিয়ে দিলেও না। উন্মাদ ব্যক্তি যেমন পূর্বকথা ভুলে যায়, তারও তেমনি অবস্থা হবে।

প্রিয়ংবদা — হায় হায়, কী সর্বনাশ না ঘটে গেল! শূন্যহৃদয়া প্রিয়সখী বুঝি অজ্ঞাতসারেই কোনো গুরুজনের কাছে অপরাধ করে ফেলল।

অনসূয়া — (সামনে তাকিয়েই) সখি! ইনি যে সে লোক নন, সুলভকোপা মহর্ষি দুর্বাসা স্বয়ং। ঐ দ্যাখ, অভিশাপ দিয়েই তিনি যেন ছুটে চলে যাচ্ছেন!

প্রিয়ংবদা — আগুন ছাড়া আর কে দগ্ধ করতে পারে? ছুটে যা। পায়ে পড়ে কোনোওভাবে ফেরা ওঁকে! ততক্ষণে আমি ওঁর পাদ্য-অর্ঘ্যের ব্যবস্থা করি।

অনসূয়া — তাই হোক। (প্রস্থান)

প্রিয়ংবদা — (কয়েকপা এগিয়েই হোঁচট খেয়ে) ওমা, আবেগে বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম বলেই বুঝি আমার ডানহাত থেকে ফুলের সাজিটা মাটিতে পড়ে গেল। (ফুল কুড়োনোর অভিনয় করলেন)।

অনসূয়া — (প্রবেশ করে) সখি! যার স্বভাবই বাঁকা তিনি কি কারো অনুনয় শোনেন! কোনো প্রকারে তাঁকে কিছুটা শান্ত করেছি।

প্রিয়ংবদা — (প্রসন্ন হয়ে) তাঁর কাছ থেকে এই যথেষ্ট। তা বল দেখি, তাঁকে কীভাবে প্রসন্ন করলি?

অনসূয়া — যখন কিছুতেই তিনি ফিরছেন না, তখন তাঁর পায়ে পড়ে বিনয়ের সঙ্গে বললাম— "ভগবান, শকুন্তলা আপনার মেয়ের মতো। আর এইটিই তার প্রথম অপরাধ। এইভেবে আপনার মতো তেজস্বী মহর্ষি কি কন্যার এই অচ্ছিাকৃত অপরাধ ক্ষমতা করতে পারেন না?"

প্রিয়ংবদা — তারপর! তারপর কী হল, বল্?

অনসূয়া — তারপর আর কী—"আমার কথার অন্যথা হয় না। তবে স্মৃতিচিহ্ন (অভিজ্ঞান) হিসেবে দেওয়া কোনো অলঙ্কার দেখাতে পারলে শাপ কেটে যাবে"—একথা বলতে বলতেই তিনি অদৃশ্য হলেন।

প্রিয়ংবদা — যাক, কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। মহারাজ যাবার সময় প্রিয়সখীর হাতে স্বনামাঙ্কিত আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে, প্রতিবিধানের উপায় সখীর হাতেই আছে।

অনসূয়া — সখি, আয়, ওর মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করি। (এই বলে পরিক্রমণ করলেন)

প্রিয়ংবদা — (চারদিক দেখে নিয়ে) সখি! দ্যাখ, দ্যাখ! বাঁ হাতের উপর মুখ রেখে কেমন চিত্রপটে আঁকা ছবির মতন বসে আছে প্রিয়সখী। স্বামীর চিন্তায় এতটাই বিভোর যে নিজের সম্বন্ধেই হুঁশ নেই, অতিথিকে দেখা তো দূর অস্ত্।

অনসূয়া — দ্যাখ প্রিয়ংবদা! ব্যাপারটা যেন আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকে। স্বভাবকোমলা প্রিয়সখীকে রক্ষা করতে হবে তো!

প্রিয়ংবদা — নবমল্লিকায় কে আর উষ্ণ জল ঢালবে, বল্?

।। **বিষ্কম্ভক**।।

(তারপর সদ্যঘুম থেকে ওঠা শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য — প্রবাস থেকে ফিরে ভগবান কাশ্যপ (কণ্ব) আমাকে বেলা নির্ণয়ের ভার দিয়েছেন। রাত আর কতটা বাকি বাইরে গিয়ে দেখে আসি। (পরিক্রমা করে) ওই তো একদিকে ওষধিপতি চাঁদ অস্তে চলেছেন, আর অন্যদিকে অরুণকে সামনে নিয়ে সূর্যদেব উদিত হচ্ছেন। তেজোময় এই দুটি বস্তুর উদয় ও বিলয় যেন মানুষকে তার দশান্তরেরই সংকেত দিচ্ছে। আর চাঁদ অস্তগত বলে কুমুদ্বতীকে দেখেও নয়নের তৃপ্তি নেই, কেননা তার শোভা এখন স্মৃতির বিষয়। প্রিয়জন প্রবাসী হলে অবলার দুঃখ সত্যিই সুদুঃসহ। বদরীপত্রে জমে থাকা শিশিরবিন্দু ঊষার আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। সদ্যজাগা ময়ূর কুশ ঘাসে ছাওয়া কুটীরের চাল ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে। আর খুরের আঁচড়ে বিক্ষত বেদীর প্রান্ত থেকে ঐ হরিণটি উঠেছে। শরীর টানটান হওয়ায় তার পিছন দিকটা ঈষৎ উঁচু হয়ে উঠেছে। আবার অন্ধকার বিদীর্ণ করে, পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর শিরোদেশে কিরণঢেলে দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর মধ্যম ধামটি অধিকার করেছিলেন যিনি—সেই চন্দ্র এখন কলামাত্র শেষ হয়ে আকাশ থেকে ঢলে পড়েছেন। মহৎ ব্যক্তির অত্যুন্নতিও পতনের কারণ।

(যবনিকা-অন্তরাল থেকে প্রবেশ)

অনসূয়া — আমরা সংসারবিমুখ বলেই ঠিক বুঝতে পারছি না। তবু একথা বলতেই হবে যে মহারাজ শকুন্তলার উপর অত্যন্ত অবিচার করছেন।

শিষ্য — যাই, গুরুকে জানিয়ে আসি যে হোমের সময় হয়েছে।

অনসূয়া — ঘুম তো ভাঙল। এখন করি কী! রোজকার কাজও করতে পারছি না। হাত-পা যেন অসাড় হয়ে পড়ছে। কামনার দেবতা এখন সকাম হয়ে উঠুন। তা না হলে আমাদের শুদ্ধ হৃদয়া সখীকে সত্যরক্ষায় অক্ষম এক ব্যক্তির দিকে কেন তিনি এগিয়ে দেবেন! (স্মরণ করে) অথবা দুর্বাসার শাপই কী সব অনর্থের কারণ? তা না হলে ঐরকম করে বলে গিয়েও এতদিনে একটা পত্রও দিলেন না। (চিন্তা করে) তাই ভাবছি, এখান থেকেই রাজাকে তাঁর নামাঙ্কিত আংটিটা পাঠাই। কিন্তু দুঃখশীলা তাপসীদের কাকে অনুরোধ করি। সব দোষতো সখীর উপরেই পড়বে। আর সেইজন্যেই তো প্রবাস থেকে ফিরে আসার পর পিতা কাশ্যপকে সকল কথা বলব বলব করেও বলতে পারছি না। বলতে পারছি না যে আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা মহারাজা দুষ্যন্তের পরিণীতা এবং আপন্নসত্ত্বা। এখন কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

প্রিয়ংবদা — (প্রবেশ করে সহর্ষে) সখি! তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। শকুন্তলা-বিদায়ের শুভানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

অনসূয়া — (সবিস্ময়ে) সখি! কী করে এ সম্ভব হল, বলতো?

প্রিয়ংবদা — তবে শোন। রাতে প্রিয়সখীর ঘুম ভালো হয়েছিল কিনা এইটে জানবার জন্য তার কাছে যাচ্ছিলাম।

অনসূয়া — তারপর! তারপর!

প্রিয়ংবদা — (তারপর আর কী!) তাত কণ্ব নিজেই সেই লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেন। বললেন—"চোখ দুটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলেও যজমানের আহুতি যথাস্থানে অগ্নিতেই পড়েছে। বাছা সুশিষ্যে প্রদত্ত বিদ্যা যেমন দুঃখের কারণ হয় না, তেমনি তোমার জন্যও অনুশোচনার কিছু নেই। আজই ঋষিপরিবৃত তোমাকে বরের কাছে পাঠিয়ে দেবো।"

অনসূয়া — পিতা কী করে ব্যাপারটা জানলেন, বলতো?

প্রিয়ংবদা — হোমঘরের প্রবেশপথে ছন্দোময়ী এক আকাশবাণীতে।

অনসূয়া — (সবিস্ময়ে) বলিস কী!

প্রিয়ংবদা — (সংস্কৃতে) "হে ব্রাহ্মণ! জগতের কল্যাণের জন্য তোমার কন্যা অগ্নিগর্ভ শমীতরুর মতো দুষ্যন্তের তেজ ধারণ করেছে, জেনো।"

অনসূয়া — (প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করে) সখী। কী প্রিয় কথাই না বললি রে! কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাওয়া হবে জেনে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি মনখারাপও করছে রে!

প্রিয়ংবদা — দ্যাখ সখি! আমরা না হয় এ বিষাদ কোনো রকমে কাটিয়ে উঠব। কিন্তু ওই তপস্বিনী (শকুন্তলা) সুখী হোক।

অনসূয়া — দ্যাখ, আমগাছের শাখায় ঝোলানো নারকেলের সাজিতে সতেজ থাকবে বলে একটা বকুল ফুলের মালা রেখেছিলাম শকুন্তলার জন্যে। সেটিকে হাতের কাছে আনতো দেখি। ইতিমধ্যে আমি গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দুর্বার শিষ প্রভৃতি মঙ্গল-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি।

প্রিয়ংবদা — তাই কর। (অনসূয়ার প্রস্থান ও প্রিয়ংবদার ফুল তোলার অভিনয়)

(নেপথে) — গৌতমী, শকুন্তলাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য শার্ঙ্গরবদের আদেশ করো।

প্রিয়ংবদা — (কানপেতে) অনসূয়া, তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর। এই তো হস্তিনাপুরগামী ঋষিদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

অনসূয়া — (ফুলের সাজি হাতে প্রবেশ) সখি আয়, আমরাও যাই।

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলাকে দেখে) সূর্যোদয়ের সময় পুণ্যস্নান সেরেছে শকুন্তলা। নীবার ধান্য হাতে স্বস্তিবচন পাঠ করে তপস্বিনীরা অভিনন্দিত করছেন তাঁকে। চল, ওঁর কাছেই যাই। (দুজনে কাছে গেল)।

(তারপর যথারীতি আসনমধ্যে উপবিষ্টা শকুন্তলার প্রবেশ)

তাপসীদের মধ্যে একজন—(শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করে) বাছা, স্বামীর কাছ থেকে বহুমানসূচক 'মহাদেবী' উপাধি লাভ করো।

দ্বিতীয়া — বাছা, বীর সন্তানের মা হও।

তৃতীয়া — বাছা, স্বামীর অশেষ প্রিয়পাত্রী হও।

(আশীর্বাদ শেষে গৌতমী ছাড়া সকলে চলে গেলেন।)

সখীদ্বয় (কাছে এসে) সখি! এই 'শিখামজ্জন (মঙ্গলস্নান বা পুণ্যস্নান) তোকে সুখী করুক।

শকুন্তলা — তোদেরও স্বাগত জানাচ্ছি। আয়, এখানে এসে বোস।

সখী দুজনে — (মাঙ্গল্যপাত্র হাতে নিয়ে) ওলো ঠিক হয়ে বোস। আয়, তোকে এবার মঙ্গলসাজে সাজিয়ে দিই।

শকুন্তলা — আমার কাছে তোদের এটুকুই আজ অনেক, অনেক রে। সখীদের হাত থেকে সাজা এরপর আমার কাছে দুর্লভ হয়ে পড়বে জানি। (বলতে বলতে অশ্রুমোচন)

সখীদুজনে — সখী, শুভ সময়ে কাঁদতে নেই। (চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাজানোর অভিনয় করতে লাগল)

প্রিয়ংবদা — অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর মতোই তোর সুরূপ। আর আমরা আশ্রমে যা জোটে তা দিয়েই তোকে সাজাচ্ছি। এ তোর রূপের অসম্মান ছাড়া কি?

ঋষিকুমারদ্বয় — (অলঙ্কার হাতে প্রবেশ করে) এই নিন অলঙ্কার। ওঁকে সাজিয়ে দিন।

গৌতমী — বৎস নারদ, কোথা থেকে এতসব পেলে?

প্রথম জন — তাত কাশ্যপের প্রভাবে।

গৌতমী — একি তাঁর মানসীসৃষ্টি?

দ্বিতীয় জন — না, না। শুনুন তাহলে। শকুন্তলার জন্য ফুল আনতে তিনি তো আমাদের আদেশ দিলেন। তারপরেই ঘটলো এই ব্যাপার! চাঁদের মতো সাদা এই মাঙ্গলিক ক্ষৌম বস্ত্রটি দিল একটি গাছ। আর একটি গাছ দিল পা-দুটি রাঙানোর উপযোগী আলতা। আরও অন্যান্য গাছগুলি বনদেবতাদের হাত দিয়ে দিল এইসকল অলঙ্কার। মণিবন্ধ পর্যন্ত প্রসারিত তাদের হাতের তালু নব কিশলয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রিয়ংবদা — (শকুন্তলার প্রতি) ওলো, এই অনুগ্রহেই সূচিত হচ্ছে, স্বামীর ঘরে রাজঐশ্বর্যভোগ করে তুই সুখেই থাকবি।

প্রথম (শিষ্য) — গৌতম এসো, এসো, অভিষেক-উত্তীর্ণ পিতা কাশ্যপকে আমরা বনস্পতিদের এই অনুগ্রহের (সেবা) কথা বলি।

দ্বিতীয় (শিষ্য) — ঠিক আছে, চলো তাই করি (প্রস্থান)

সখীদ্বয় — ওলো, কখনো অলঙ্কার পরিনি তো! তাই ছবিতে যেমন দেখেছি তেমনি ভাবেই তোর অঙ্গে অলঙ্কার পরাব।

শকুন্তলা — এ বিষয়ে তোদের নৈপুণ্যের কথা তো আমি জানি, সখি।

(দুজনে অলঙ্কার পরাণোর অভিনয় করতে লাগল।)

(অতঃপর অভিস্নাত কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ — শকুন্তলা আজই চলে যাচ্ছে বলে আমার হৃদয় উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। চোখের জল আটকাতে গিয়ে কণ্ঠ অবরুদ্ধ। চিন্তাভারে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। স্নেহ-আদর যদি আমাদের মতো অরণ্যবাসীদের চিত্তকেও এমনভাবে বিকল করে দেয়, তা হলে, এরূপ ক্ষেত্রে কন্যাবিচ্ছেদের বিষাদ গৃহী নর-নারীকে কতই না পীড়িত করে! (এ সকল ভাবতে ভাবতে ঘোরা-ফেরা করতে লাগলেন)।

সখীযুগল — ওলো শকুন্তলা! সাজানো-পর্ব তো শেষ হল। এবার এই রেশমী শাড়ী জোড়া পর তো দেখি।

(শকুন্তলা উঠে শাড়ী পরল।)

গৌতমী — বাছা, আনন্দোচ্ছল চোখে তোমাকে স্নেহে আলিঙ্গন করতে গুরু (পিতা কাশ্যপ) এসেছেন। তাহলে এবার আচার পালন করো।

(লজ্জাবনতা শকুন্তলা পিতাকে প্রণাম করলেন।)

কাশ্যপ — বৎসে, শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির সমাদর পেয়েছিলেন, তুমিও তেমনি তোমার স্বামীর সমাদর লাভ করো। শর্মিষ্ঠা যেমন সুসন্তান পুরুকে লাভ করেছিলেন, তুমিও তেমনি রাজ্যেশ্বর সুপুত্র লাভ করো।

গৌতমী — ভগবন্, এ তো কেবল আশীর্বাদ নয়, এ হল বর।

কাশ্যপ — বৎসে, সদ্য-প্রজ্জ্বলিত এই যজ্ঞীয় অগ্নি-প্রদক্ষিণ করো।

(সকলে প্রদক্ষিণ করলেন।)

বৎসে, এই যে সমিদ্বন্ত বেদীর চারদিকে প্রজ্জ্বলন্ত যজ্ঞীয় অগ্নি, এর প্রান্তভাগে ছড়ানো কুশতৃণ, হোমগন্ধে পাপনাশী এই পূতাগ্নি তোমাকে পবিত্র করুন।

(শকুন্তলা যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করলেন।)

বৎসে, এবার তাহলে এসো। (চারিদিক দেখে) শার্ঙ্গরবেরা সব কোথায়?

শিষ্যগণ — (প্রবেশ করে) ভগবন্, এই যে আমরা।

কাশ্যপ — তোমাদের ভগিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।

শার্ঙ্গরব — দিদি, এদিকে, এদিকে। (সকল পরিক্রমা করলেন।)

কাশ্যপ — ওগো সন্নিহিত তপোবন-তরুরাজি! তোমাদের আগে জল দান না করে যে নিজে জল পান করত না, ভূষণপ্রিয়া হলেও নিজেকে সাজানোর জন্য তোমাদের একটি পল্লবও ছিঁড়ত না, তোমাদের প্রথম ফুলফোটা শুরু হলে যার আনন্দের সীমা-পারসীমা থাকত না (যার উৎসব শুরু হয়ে যেত), সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছে—তোমরা সকলে সম্মতি দাও!

(কোকিলের ডাক শুনছেন—এমন ভাব দেখিয়ে)

শকুন্তলার অরণ্যবন্ধু বৃক্ষরাজি যেন অনুমতি দিয়েছে। কোকিলের কুহুরবই তাদের সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর। শকুন্তলার যাত্রাপথে পড়বে সবুজ পদ্মপাতায় ঢাকা সরোবর। ছায়াবীথি রোদের খরতাপকে প্রশমিত করবে। শান্ত ও অনুকূল বাতাস বইতে থাকবে। পথের ধূলি হবে পদ্মরেণুর মতো কোমল। যাত্রাপথ হবে শুভ—মঙ্গলময়।

(সকলে সবিস্ময়ে শুনলেন।)

গৌতমী — পরমাত্মীয়ের মতো স্নেহময়ী বনদেবিগণ তোমার পতিগৃহগমনকে সমর্থন করেছেন। অতএব এঁদের সকলকে প্রণাম করো বৎসে।

শকুন্তলা — (প্রণাম শেষে পরিক্রমা কালে, আড়ালে) ওলো প্রিয়ংবদা, যদিও আর্যপুত্রকে দেখবার জন্যে উতলা হয়েছি, তবুও এই আশ্রম ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে বেদনায় পা আর এগোতেই চাইছে না।

প্রিয়ংবদা — সখি! তুই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হয়েছিস তা নয়। তোর আসন্ন

বিচ্ছেদ-বেদনায় তপোবনেরও একই অবস্থা হয়েছে, দ্যাখ। হরিণের মুখ থেকে খসে পড়ছে দর্ভ। ময়ূর-ময়ূরী ছেড়েছে নাচের আনন্দ, লতাবিতান থেকে খসে পড়ছে শুকনো পাতা, মনে হচ্ছে তারা যেন চোখের জল ফেলছে।

শকুন্তলা — (হঠাৎ মনে পড়ায়) পিতা, প্রিয় লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে আমন্ত্রণ করে যাই?

কাশ্যপ — বৎসে, আমি জানি, তুমি তাকে নিজের বোনের মতোই স্নেহ করতে। এই যে তোমার ডান দিকেই রয়েছে সে।

শকুন্তলা — (কাছে এসে আলিঙ্গন করে) বনজ্যোৎস্নে। সহকার তরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকলেও তোমার শাখা-বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করো। আজ থেকেই তোমাকে ছেড়ে দূরে চললাম।

কাশ্যপ — বৎসে, অনেক আগে থেকেই তোমার জন্য উপযুক্ত বরের কথা ভাবতাম। নিজের সুকৃতির ফলেই তুমি তা পেয়েছো। এই নবমল্লিকাও পেয়েছে সহকারকে। এখন তোমার ও নবমল্লিকার—কারও জন্যে আর আমার চিন্তা নেই। তাহলে এবার পথের দিকে তাকাও।

শকুন্তলা — (সখীদের কাছে গিয়ে) ওলো, একে (বনজ্যোৎস্না-নবমল্লিকা) তোদের হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।

দুজনে — সখি, আর আমাদের কার হাতে দিয়ে যাচ্ছিস, বল? (রোদন)

কাশ্যপ — অনসূয়া, কেঁদো না। তোমরাই তো ওকে সুস্থির করবে।

শকুন্তলা — পিতা, গর্ভভারে মন্থর যে মৃগবধূটি কুটীরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যেদিন নির্বিঘ্নে প্রসব করবে—সেই প্রিয় খবরটি কাউকে দিয়ে অবশ্যই আমার কাছে পাঠিয়ো।

কাশ্যপ — বৎসে, একথা কখনোই ভুলব না।

শকুন্তলা — (চলতে গিয়ে বাধা পেয়ে) ওমা! আমার কাপড়ে কে যেন লেগে রয়েছে! (ফিরে তাকালেন)

কাশ্যপ — বৎসে! কুশ ঘাসের তীক্ষ্ণ আগায় যার মুখে ঘা হলে সেই ঘা শুকোনোর জন্য ইঙ্গুদী তেলের প্রলেপ দিতে, মুঠো মুঠো শ্যামাক ধান খাইয়ে যাকে তুমি বড়ো করে তুলেছ, তোমার পুত্রতুল্য মৃগপদবীযুক্ত সেই হরিণটিই তোমাকে ছাড়তে চাইছে না।

শকুন্তলা — বাছা, আমি যে তোদের সংসর্গ ছেড়ে যাচ্ছি; আর আমার পেছনে আসিস কেন? তোকে জন্ম দিয়েই তোর মা মারা গেল। তারপর আমিই তোকে পালন করে বড়ো

করে তুলেছি। আমি চলে গেলে এখন থেকে পিতা কাশ্যপই তোর দেখ-ভাল করবেন। তুই ফিরে যা? (কাঁদতে কাঁদতে চলার ভাব-প্রদর্শন।)

কাশ্যপ — বৎসে, কেঁদো না। স্থির হও। পথের এদিকে চেয়ে দ্যাখো!—তোমার চোখের পাপড়িগুলি ওপরে উঠছে। অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন তোমার দৃষ্টি বাধা পাচ্ছে। অশ্রু সংবরণ করো। স্পষ্ট পথ দেখতে পাচ্ছো না বলে উঁচু-নিচু পথে তোমার পা ঠিক মতো পড়ছে না।

শার্ঙ্গরব — ভগবন্। শুনেছি প্রিয়জনকে শেষ জলাশয় পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই রীতি। তা সেই সরোবরতীর এসে গেছে। তাই এখানেই আমাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ-বার্তা দান করে আপনি আশ্রমে ফিরে যান।

কন্ব — তাহলে এসো, এই বকুল গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিই। (সকলে সেখানে এলেন।)

কাশ্যপ — (আত্মগতভাবে) মান্যবর দুষ্যন্তের উপযোগী কোন্ বার্তা পাঠানো উচিত হবে। (ভাবতে লাগলেন)

শকুন্তলা — (জনান্তিকে) ওলো, দ্যাখ, দ্যাখ। পদ্মাপাতার আড়ালে সহচরকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল চক্রবাকী বিলাপ করছে! আমি তাহলে দুঃসাধ্য সাধনই করছি, বল্!

অনসূয়া — সখি! এমন ভাবছিস কেন। এই চক্রবাকীকেও প্রিয়জন ছাড়াই বিষাদদীর্ঘ রাত কাটাতে হয়। আশার বাঁধনই দুঃসহ বিরহবেদনাকে হাল্কা করে দেয়।

কাশ্যপ — শার্ঙ্গরব! শকুন্তলাকে সামনে রেখে আমার কথা-অনুযায়ী সেই মহারাজা দুষ্যন্তকে সম্বোধিত করে বলবে—

শার্ঙ্গরব — আদেশ করুন, প্রভু!

কাশ্যাপ — সংযমই আমাদের মূলধন, আর আপনিও উচ্চকুলজাত! আপনার প্রতি শকুন্তলার যে অনুরাগ তাও প্রিয়জনের অজ্ঞাতেই কোনো না কোনো ভাবে ঘটেছে। এই সব ভাল ভাবে বিবেচনা করেই এঁকে সপত্নীদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেবেন, আশাকরি। এরপর কোনো কথা বধূর আত্মীয়দের বলা উচিত নয়। ওঁর কপালে যা আছে তাই হবে!

শার্ঙ্গরব — মহারাজকে নিবেদন করবার জন্যে আপনার এই বার্তা গ্রহণ করলাম।

কাশ্যপ — (শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে) বৎসে! এবার তোমাকেও উপদেশ দেবো। আমরা বনবাসী, কিন্তু লৌকিক বিষয়ের কিছুই জানিনা এমন তো নয়।

শার্ঙ্গরব — ভগবন্। ধীমান ব্যক্তিদের অজানা তো কিছুই নেই!

কাশ্যপ — সেই তুমি এখান থেকে পতিকুলে গিয়ে—

গুরুজনদের সেবা-শুশ্রূষা করবে। সপত্নীদের প্রিয়সখীর মতো দেখবে। স্বামী কোনো কারণে তোমার প্রতি রুষ্ট হলেও ক্রোধের বশে তুমিও তার বিরুদ্ধতা করবে না। পরিচারিণীদের প্রতি দানশীল ও সদয় হবে। ভোগে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাবে না। এইরূপ আচরণ করলে যুবতীরা গৃহিণীপদে অভিষিক্তা হন।

বিপরীত আচরণকারিণীরা কুলের অধম।

এবার দেখা যাক গৌতমীই বা কী বলেন।

গৌতমী — এইগুলিই তো বধূজনের প্রতি যথার্থ উপদেশ। বাছা, এর সবগুলিই মনে রেখো।

কাশ্যপ — বৎসে, এসো আমাকে ও তোমার সখীদের আলিঙ্গন করো।

শকুন্তলা — পিতা, সখীরা কি এখান থেকেই ফিরে যাবে ?

কাশ্যপ — বৎসে, এদেরও তো সম্প্রদান করতে হবে ! তাই এদের সেখানে যাওয়া উচিত হবে না। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাচ্ছেন।

শকুন্তলা — (পিতাকে জড়িয়ে ধরে) বাবা, তোমার স্নেহের কোল থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মলয়তট থেকে উন্মূলিত চন্দন লতার মতো অন্য দেশে গিয়ে কী করে বেঁচে থাকবো ? (কান্না)

কাশ্যপ — বৎসে, কাতর হচ্ছ কেন ? উচ্চকুলে গৌরবময় গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হয়ে, প্রচুর সম্পদের অধিকারিণী হয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়ত ব্যস্ত থেকে এবং অনতিকালেই প্রাচী যেমন অর্ককে প্রসব করে তেমনি তুমিও সূর্যের মতোই তেজস্বী ও পবিত্র সন্তানের প্রসূতি হয়ে আমাদের বিরহ দুঃখ ভুলেই থাকবে।

(শকুন্তলা পিতার চরণে প্রণতা হলেন।)

বৎসে, আমি যেমন ভেবেছি, যেন তেমনই হয়।

শকুন্তলা — (সখীদের কাছে গিয়ে) ওলো, তোরা দুজনে একসঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয় — (আলিঙ্গন করে) সখি। যদি সেই রাজর্ষি তোকে চিনতে দেরী করেন, তাহলে তাকে তাঁরই নামাঙ্কিত আংটিটি দেখাস।

শকুন্তলা — তোদের এই সংশয়ে আমি কেঁপে উঠছি।

সখীদ্বয় — সখি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অতি স্নেহ (অনেক সময়) অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গরব — (আকাশের দিকে তাকিয়ে) সূর্যদেব যুগান্তরে প্রবেশ করেছেন (অর্থাৎ বেলা দ্বিপ্রহর)। আপনাদের আর দেরী করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি করুন।

শকুন্তলা — (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করে আশ্রমের দিকে ফিরে) পিতা, আবার কবে তপোবন দেখতে পাবো ?

কাশ্যপ — শোনো তবে—

সুদীর্ঘকাল সসাগরা পৃথিবীর সপত্নী হয়ে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুষ্যন্ত-তনয়কে সিংহাসনে বসিয়ে এবং তার উপর প্রজাদের ভার অর্পণ করে, তারপর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তরসাস্পদ এই আশ্রমে আবার আসবে।

গৌতমী — বাছা, যাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে। তোমার পিতাকে এবার ফিরে যেতে বলো। না হলে উনি বারম্বার এইভাবেই কথা কইবেন।

শকুন্তলা — (আবার পিতাকে আলিঙ্গন করে) তাত, তপশ্চর্যায় আপনার শরীর রোগা হয়ে পড়ছে। তাই আমার জন্য বেশি ভাববেন না।

কাশ্যপ — বৎসে, কুটীর প্রঙ্গণে তোমার বোনা নীবার ধান অঙ্কুরিত হয়েছে। এ দেখে আমার শোক কেমন করে প্রশমিত হবে বলো ? এবার এসো মা ! তোমার যাত্রা শুভ হোক। (শকুন্তলা ও তার অনুগামীদের প্রস্থান)

সখীদ্বয় — (অনেকক্ষণ ধরে শকুন্তলাদের চলে যাওয়া দেখতে দেখতে করুণ স্বরে) হায় হায়, ঐ শকুন্তলা বনরাজির আড়ালে চলে গেল!

(আর দেখা যাচ্ছে না তাকে।)

কাশ্যপ — (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) অনুসূয়া ! তোমাদের সহচারিণী চলে গেল। শোক ভুলে এবার আমার সঙ্গে এসো।

সখীদ্বয় — পিতা, শকুন্তলা ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করব।

কাশ্যপ — স্নেহের কারণেই এমনটা মনে হচ্ছে। (বিমর্ষ চিত্তে পরিক্রমা করে) শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলাম। কেননা কন্যা সন্তান যেন পরের গচ্ছিত ধন। তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আমার মনের ভার হাল্কা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, যার ধন তার কাছেই তাকে সমর্পণ করেছি। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

৬.৩.১২.২ : 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কাশ্রিত রসগ্রাহী বিশ্লেষণ

(ক) চরিত্র—অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে মুখ্য ও গৌণ চরিত্র মিলিয়ে মোট চরিত্র সংখ্যা-৪৭। তার মধ্যে চতুর্থ অঙ্কে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ চরিত্রগুলির অল্পবিস্তর বিশ্লেষণ আমাদের কাম্য। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে চরিত্রটি আমাদের প্রেক্ষণবিন্দুতে জ্বল জ্বল করেন তিনি মহর্ষি কাশ্যপের পালিতা কন্যা, আশ্রমের প্রাণ, তপোবনপ্রিয়া শকুন্তলা। গান্ধর্ব মতে বিবাহিতা, মহারাজা দুষ্যন্তের ভার্যা, আপন্নসত্তা শকুন্তলা অপার্থিব সৌন্দর্যে লাবণ্যময়ী। তাঁর স্নিগ্ধ মাধুর্য, ধীর স্বভাব ও কমনীয় কান্তি প্রেমিক দুষ্যন্তের সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও প্রেমের বোধকে বহুগুণিত করেছিল। সেই অবস্থান থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল শকুন্তলার দেহবল্লরী ঘিরে সৌন্দর্যের যে কাঙ্ক্ষিত আবরণ তা উদ্যানলতার নয়। তপোবন লতার। সুতরাং তাঁর স্বীকার করতেও বাধেনি যে তপোবনলতা উদ্যানলতাকে হারিয়ে দিয়েছে—

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।।" (অশ ১/১৬)

এই উদ্যানলতা যেদিন প্রেমের স্পর্শে নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, সেদিনই আকস্মিকভাবে তাঁর উপরে নেমে এল দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ। স্বামীচিন্তায় আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলা। 'সুলভ কোবা মহেসি' (সুলভকোপা মহর্ষি) দুর্বাসার আশ্রমের কুটীরদ্বারে উপস্থিতি এবং আত্মঘোষণা 'অয়মহং ভোঃ'! —এর কিছুই তাঁর কানে গেল না। অভিশপ্তা হলেন তিনি। আতিথ্যধর্মভ্রষ্টার প্রতি নিষ্ঠুর-নির্মম কশাঘাত—যার চিন্তায় তিনি মগ্না সেই প্রিয়জন তাঁকে ভুলে যাবে পাগলের মতো; বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেও তিনি তাঁকে চিনতে পারবেন না—

"স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"

অতঃপর শুরু হল তাঁর প্রেমের তপস্যা। তাঁকে ছায়ার মতো ঘিরে দুই প্রিয়সখী—অনসূয়া ও পিয়ংবদা প্রিয়সখীকে অযাচিত অভিঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে নিরন্তর সচেষ্ট। শকুন্তলাকে নিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ ও দুর্বাভাবনার অন্ত নেই। স্বস্তি একটাই—অভিশাপ প্রতিবিধানের উপায় শকুন্তলার নিজের হাতেই আছে—মহারাজের প্রিয়সখীকে প্রদত্ত স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি। সুতরাং প্রিয়সখীকে 'স্বাধীনোপায়া বলতেই হবে। এই সখীদ্বয়ের আলাপচারিতা থেকেই শকুন্তলার স্বভাববৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের যা কিছু বোধ। নায়িকা নিজে নাটকমধ্যে কথা বলেছেন খুবই কম, অথচ তাঁর স্রষ্টা মহাকবি তাঁর না বলা বাণীতে কত কথাই না, বলিয়ে নিয়েছেন। এ যেন আধুনিক কবির একটি গীতির কয়েক পংক্তির পূর্বরূপ—'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি।' (রবীন্দ্রনাথ)

শকুন্তলা মহর্ষি কাশ্যপের পালিতা কন্যা, অশেষ স্নেহের পাত্রী, প্রকৃতিপ্রিয়া, আশ্রমের প্রাণ। তাঁর কর্তব্যবোধ, সেবা-পরিচর্যার গুণে তপোবন-আশ্রমের সবার মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। আশ্রমের

গুরুজন, ভাই-বোন, বন্ধু, বৃক্ষ, তরুলতা, জীবজন্তু-সবার প্রতি তাঁর সমান মমতা, সমান দৃষ্টি, সমান স্নেহ-ভালোবাসা। সেবাময়ী, মমতাময়ী, সমদৃষ্টি ও প্রেমতপাস্বিনী শকুন্তলার চারিত্র্যমহিমা সমগ্র নাটকের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কেই ফুটেছে ভালো। মিলন-বিরহ, রাগ-অনুরাগের বিচিত্র সিঁড়ি ভেঙে প্রেমসাধনার যে দুশ্চর পথ পাড়ি দিতে হয়, তার মূর্ত প্রতীক যেন এই শুকুন্তলা। আত্মগ্রহণের আনন্দ ও আত্মত্যাগের তীব্র দহনে দীপ্ত জ্যোর্তিময়ী শকুন্তলা মহাকবি কালিদাসসৃষ্ট বোধকরি শ্রেষ্ঠ প্রতিমা—বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম বিরল সৃষ্টি।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা

কবি-নাট্যকার কালিদাসের অপর দুটি অতুল সৃষ্টি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। বস্তুত শকুন্তলা-অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা—তিনটি চরিত্রই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তাঁদের মধ্যেকার অন্তর্লীন সখ্য তাঁদের এমনই এক আত্মপরভেদহীন অভিন্ন সূত্রে বেঁধেছে যে কোনো বিশেষ-একজনকে বিচ্ছিন্ন করে বেছে নিয়ে যেন সেই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফোটানোই যায় না। একই বৃন্তে ফুটে ওটা তিনটি পুষ্পকলির মতোই নির্মল-সুন্দর-মনোরম তাঁরা। শুকুন্তলার কথা আলাদা করে পর্যালোচনা করতে হয়েছে নাটকের সমগ্র অংশে তাঁর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ আছে বলে। কেননা তিনিই নাট্যকারর লক্ষ্য। তাঁর নামেই নাটকের শিরোনাম। সুতরাং নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়িকা তিনিই। তা সত্ত্বেও আমাদের ভুললে চলবে না, নায়িকা শকুন্তলাকে স্ফুটোজ্জ্বল প্রকাশরূপ দানের পেছনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল তাঁর অভিন্ন-হৃদয় দুই প্রিয়সখী—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার। তাই আমাদের বলতেই হয়, একা শকুন্তলা অসম্পূর্ণা, খণ্ডিতা, অনুসূয়া-প্রিয়ংবদাই তাঁকে পূর্ণ করে তুলেছে।

প্রিয়সখী শকুন্তলার গুণৈশ্বর্যের প্রায় সর্বাংশের দাবিদার তাঁরা। স্নেহ-প্রেম-মমতা স্যেন্দর্য-সেবা-ধৃতি-ত্যাগ ও কল্যাণব্রতে তাঁরা প্রিয়সখীর প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই। অনেক সময় বোধ করি তাঁকেও ছাড়িয়ে গেছেন। নিজেদের প্রেমতৃষ্ণার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ সংগুপ্ত রেখে সখী শকুন্তলার প্রেমের পাত্রটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলবার জন্য তাঁদের যত্নের যেন শেষ নেই। যাকে ভালোবাসেন সেই শকুন্তলার প্রিয়বিরহে তাঁরা বিষণ্ণ হন। দুর্বাসার অভিশাপের ফল যাতে না ফলে তার জন্যে তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। আবার কোনো কারণে পতিগৃহে যদি প্রিয়সখীর অনাদর ঘটে, যদি মহারাজা তাঁকে চিনতে না পেরে নিগ্রহ করেন—সেই অনাগত দুর্ভাবনার ভারও নীরবে বহন করেন তাঁরাই। আর তাঁদের নাম দুটিও কত না সুন্দর! অনসূয়া অর্থাৎ যার ঈর্ষ্যা-অসূয়ারূপ ঘৃণা নেই এবং প্রিয়ংবদা অর্থাৎ যে সব সময় প্রিয় কথা—মিষ্টি কথা বলে। প্রিয়সখী শকুন্তলার সুখে সুখী, তাঁর দুঃখে দুঃখী এমন আত্ম-উৎসর্জিতা সরল-নির্মল হৃদয়া রমণী চরিত্র যেমন জগতে নজিরহীন, তেমনি তাদের অপূর্ব সখীত্বও জগতে বিরল। নাটকমধ্যে চরিত্র হিসেবে তাঁদের স্থান গৌণ হলে কি হবে, শকুন্তলা চরিত্রস্ফূর্তির অনুঘটক রূপে তাঁরা সহজেই দর্শক-শ্রোতার হৃদয়াসন নিঃশেষে অধিকার করে বসেছেন। তাঁদের গুপ্তপ্রেম প্রিয়সখীর আত্মহারা প্রেমের শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে ভাবীকালের নায়িকার পূর্বসুরে যেন সহজেই বলতে পারে—"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।' অথবা 'বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি/রূপসী তোমার রূপে।' (চণ্ডীদাস)

মহর্ষি কাশ্যপ বা কণ্ব

মহর্ষি কাশ্যপ (কণ্ব) আশ্রম প্রধান, শকুন্তলার পালক পিতা। আশ্রম পরিচালনার পুরোধা হিসেবে

আশ্রমিক পরিবেশটিকে প্রশান্ত ও ঈশ্বর আরাধনার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। আশ্রমের সকল প্রতিবেশী, গাছ-পালা জীবজন্তু সকলকে নিয়ে তপোবন-কেন্দ্রিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির জীবন্ত উত্তরাধিকার বহন করেছেন তিনি। পূজার্চনা, যজ্ঞ-হোম, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আশ্রমিক জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সুব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি। গাহস্থ্য জীবন থেকে দূরে তপোবনে কামনা-বাসনামুক্ত, অহিংসা-দীপিত ব্রহ্মর্ষির জীবন যাপনে অভ্যস্ত তিনি। তৎসত্ত্বেও মানবিক প্রত্যাশা ও মূল্যবোধগুলিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবল বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ আঁকড়ে থাকেননি। মহর্ষি জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত এই ব্যক্তিত্ব গৃহী নর-নারীর কল্যাণের জন্যই লৌকিক বিষয়সমূহের প্রতিও সমানভাবে আগ্রহী। চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলাকে বিদায় দিতে গিয়ে গৃহীর ধর্ম সম্পর্কে যে সকল কথা তিনি বলেছেন তাতে বিস্মিত শিষ্য-কন্যাদের মনে প্রশ্ন স্বাভাবিক। তাই তাদের সংশয় দূর করবার জন্যই তিনি বলেন, 'বনৌকসোহপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।'—অর্থাৎ তিনি বনবাসী হলেও লৌকিক বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নন। আরণ্যক সন্ন্যাসজীবন ও সংসার জীবনের সুষ্ঠ মেলবন্ধনেই যে জীবনের পূর্ণতা—কাশ্যপ চরিত্রাশ্রয়ে মহাকবি এই বার্তাটাই যেন আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বস্তুত সন্ন্যাসীর নির্মোহ, কঠোরতা এবং গৃহীর স্নেহ-প্রীতি-মমতা-ভালোবাসা-করুণারূপ দুর্বলতার অত্যাশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে কাশ্যপ চরিত্রে। স্নেহময় পিতারূপে তিনি শকুন্তলার গোপন বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিবাহিতা কন্যাকে বিশেষতঃ আপন্নসত্ত্বা কন্যাকে অবিলম্বে পৃতিগৃহে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে যথার্থ পিতৃকর্তব্য সমাধা করেছেন। শকুন্তলার পাতিগৃহ গমন যাতে সুষ্ঠু, নির্বাধ ও কল্যাণকর হয় তার জন্য তিনি সজাগ। কন্যাবিদায়রূপ সংবেদনশীল বিষয়টি যাতে দেবার্চনা, পূজা-হোম, গুরুজনের আশীর্বাদ ও উপদেশ-নির্দেশে শুভঙ্কর হয়ে ওঠে তারই জন্য যথাসময়ে গৌতমী ও অন্যান্য জ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনীদের ডেকে পাঠান, অনসূয়া-প্রিয়ংবদাদের ভূমিকা ঠিক করে দেন এবং শার্ঙ্গরব-শারদ্বত-গৌতম-নারদ-বৈখানস প্রভৃতিদের যথাকর্তব্য বাৎলে দেন।

অত্যন্ত স্নেহাদরে পালিতা কন্যা শকুন্তলা যে আশ্রমের প্রাণ-এ সত্য তিনি জানতেন। আশ্রমের গাছপালা, ফুল-ফল-জীবজন্তুও যে শকুন্তলার উপরে কতটা নির্ভরশীল তা জানতেন বলেই তিনি শকুন্তলাকে যেমন তপোবন প্রকৃতির কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করতে বলেন, তেমনি নিজেও 'ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরবঃ।...' ইত্যাদি বলে সকল বনদেবতাদের কাছে শকুন্তলার বিদায়ে তাঁদের সম্মতি চেয়ে নেন। আবার শকুন্তলার ইচ্ছে—তাঁর দুই প্রিয়সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা হস্তিনাপুর গমনের সঙ্গী হোক—তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আবেদন নাকোচ করে দিয়ে তাঁকে বলেন—'ওঁরা অবিবাহিতা, তাই তোমার সঙ্গে ওঁদের সেখানে যাওয়া উচিত হবে না''—'তন্ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্।'

শকুন্তলার বনজ্যোৎস্না—নবমল্লিকা ও মাতৃহারা মৃগশিশুটির প্রতি প্রীতি লক্ষ্য করে তাঁর হৃদয় আকুলিত হয়। আবার শকুন্তলা বনরাজির আড়ালে চলে গেলে সঙ্গীরা যখন হায়, হায় করে ওঠে এবং পিতাকে বলে, 'তাত, শকুন্তলা ছাড়া যেন শূন্য তপোবনে প্রবেশ করবো; তার উত্তরে পরম স্থৈর্যে, পরম স্নেহে তিনি বলেন, 'স্নেহপ্রবৃত্তিরেবং দর্শিনী।'—স্নেহের বশেই তোমাদের এমন মনে হ'চ্ছে।' চিরকালের আপেক্ষিক তত্ত্বদর্শনের কথায় মহর্ষির সংযম, বাস্তববোধ ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠে।

ঋষি হয়েও তিনি যে সাধারণ গৃহীর মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ তার পরিচয় আছে চতুর্থ অঙ্কের শেষদৃশ্যে। এখানে মহর্ষি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশোন্মুখ কন্যাকে গৃহের সুখ-স্বাস্থ্য ও শান্তি বজায় রাখার জন্য

উপদেশ দেন—'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে'..... ইত্যাদি এবং শেষে গৃহবধূর একান্ত প্রার্থিত 'গৃহিণীপদ' লাভের কথা—'যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ।।' (অশ.৪/১৮) আর সব শেষে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেলে তাঁর উপলব্ধি—তিনি যেন একটা বিরাট ভার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন। এর অনুকূলে যে যুক্তি তিনি খাড়া করেছেন তাও তাঁর চরিত্রটিকে একটি স্ফুটোজ্জ্বল মহিমা দান করেছে। তাঁর অনুভূতি—কন্যা যেন পরগৃহে অধিকারীর গচ্ছিত অর্থ। সেই সম্পদকে যথার্থ মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়েই তিনি যেন পরম স্বস্তি পেয়েছেন—

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিহগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।।" (অশ ৪।২২)

মহর্ষি কাশ্যপ একাধারে ঋষি কবি, দার্শনিক, নীতি-আদর্শনিষ্ঠ কর্তব্য পরায়ণ এবং স্নেহ-মমতাময় পিতা। তাঁর চরিত্রটিও মহাকবির অতুলনীয় সৃষ্টি।

দুষ্যন্ত

মহাকবি কালিদাসের চরিত্রাঙ্কন দক্ষতার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন মহারাজা দুষ্যন্ত। তিনি প্রজাপালক, দুর্ধষ বীর, খেয়ালী, প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক। আবেগপ্রবণ কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ, কর্তব্যবোধে অবিচলিত কিন্তু রঙ্গ-রসিকতাপ্রিয় ও ললিতকলানিপুণ। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, গ্রহণ ও ত্যাগ, ভোগ ও ভোগবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও সংযম প্রভৃতি দক্ষিণ নায়কের সব গুণ ও দোষগুলিই তাঁর চরিত্রে বর্তমান। ফলে দুষ্যন্ত চরিত্রটি সজীব, প্রাণবান ও গতিশীলতা-মণ্ডিত বাস্তব ও স্বাভাবিক।

মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে অজ্ঞাত সারেই তাঁর মহর্ষি কাশ্যপের (কণ্বের) তপোবনে প্রবেশ। শিকার ও শিকারীর মধ্যস্থলে আশ্রম বালকের উচ্চারিত কণ্ঠরব—নিষেধবার্তা—'ভোঃ ভোঃ রাজন্! আশ্রমমৃগোঽয়ম্ ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।'—মহারাজ! এ আশ্রমের মৃগ, একে বধ করবেন না।' শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঔচিত্য সচেতন মহারাজার অশ্ববল্গা কষে রথ থেকে অবতরণ এবং সংযত ও বিনম্র ভাষায় ভগবান কাশ্যপ ও আশ্রমবাসীদের কুশলগ্রহণে তাঁর চরিত্রের ধীরোদাও রূপটি স্পষ্ট হয়।

দুষ্যন্ত প্রেমপূজারী। বহুভর্তৃক হলেও যথার্থ প্রেমের পেয়ালাটি বোধকরি তখন অপীতই ছিল। তাই তপোবন পরিবেশে প্রকৃতির সুদুর্লভ সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে বিভাসিতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মধ্যে অন্তঃসলিলা প্রেমের ধারায় জোয়ার আসে। দুর্লভ দক্ষিণবাহু স্পন্দনে অভাবনীয় অথচ অভিলষিত বস্তুটি (শকুন্তলা) লাভের প্রত্যাশা তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। অবশেষে শকুন্তলার সান্নিধ্যলাভ এবং আলাপে-প্রলাপে-সংরাগে 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবে'র প্রার্থিত মঙ্গলমিলনে আপন্নসত্ত্বা প্রেয়সীকে স্বনামাঙ্কিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক দান ও রাজবধূরূপে তাঁকে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি। শকুন্তলার প্রণয়ে বিগলিতচিত্ত দুষ্যন্তের রাজধানীতে ফেরবার জন্য রাজমাতার আহ্বান ও ব্যর্থ হলে বয়স্য মাধব্যকে বলা 'পরিহাস বিজল্পিতং' কথাটির গূঢ়ার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত গান্ধর্বমতে শকুন্তলার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হলেও

তাঁর মনের মধ্যে কোনো প্রকার আক্ষেপ বা অনুশোচনা ছিল না। তাঁর রাজকীয় আভিজাত্য ও আরণ্যক শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ে বাধা হয়ে ওঠেনি। তাই তাঁকে—দেশের মহারাজার মতো ধীমান, প্রতাপশালী, বীর ও প্রজানুরঞ্জক, আর্যপুত্র রাজর্ষিকে বিশ্বাস করে শকুন্তলা কোনো অন্যায় করেন নি। সুতরাং উভয়ের প্রেমের উপলব্ধিতে বিশেষ ঘাটতি ছিল বলে মনে হয় না।

যথার্থ প্রেমের পরিণতি মঙ্গলমিলনে। সন্তানলাভ অতিরিক্ত পাওনা। গান্ধর্বমতে বিবাহও সংস্কার সিদ্ধ। সুতরাং রাজার চরিত্রে লাম্পট্যের ছায়া নেই। তৎসত্ত্বেও শকুন্তলা ও দুষ্যন্ত—উভয়ের দিক থেকেই অশরীরী ছায়ার মতো অজ্ঞাত একটা অপরাধ হয়তো ঘটে গেছে কেননা, তাঁদের পবিত্র বিবাহটি অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া সকল স্বজন-পরিজনের অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। সুতরাং আপাত বিচারে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ আশ্রম বা রাজ্য অনুমোদিত নয়।

আর দ্বিতীয় যে অপরাধের শাস্তি তাঁরা দুজনেই বহন করেছেন তার জন্যে দুষ্যন্তের কোনো দায় ছিল না। কর্তব্যকর্মে অবহেলা, আত্মবিস্মৃতি ও দুর্বাসার অভিশাপের জন্য যদি কেউ দায়ী থাকেন, তবে তিনি শকুন্তলা স্বয়ম্। আত্মচিন্তায় কর্তব্যে অবেহলা, আতিথ্যের অপমান প্রাচীন ভারতীয় সংস্কার অনুযায়ী এক ধরণের অপরাধ—শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই অপরাধেই দুর্বাশার শাপে অভিশপ্তা শকুন্তলা। কিন্তু এক্ষেত্রে দুষ্যন্তের অপরাধটা কোথায়? রাজধানীতে নবপরিণীতা শকুন্তলার যে নিগ্রহ, তার জন্য দুষ্যন্তের দায় ছিল কি? তাঁর আত্মবিস্মৃতিও তো দুর্বাসার শাপের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া! দুষ্যন্ত প্রেমিক হিসেবে, রাজা হিসেবে কতটা সফল তার চূড়ান্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন স্বর্গপ্রত্যাগমন কালে ভগবান মারীচের আশ্রমে পুত্র সর্বদমন (ভরত) সহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি শকুন্তলাকে দেখে। প্রবল অনুশোচনার তাপে পুড়ে পুড়ে দুষ্যন্ত প্রেমের অয়স্কান্ত সুরভি যেদিন অনুভব করেছেন, সেদিনই অদৃষ্ট তাঁকে নিয়ে গেছে মারীচের আশ্রমে। সেখানে প্রেমের তপস্যায় উত্তীর্ণা এই বিরহিণী শেষ পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষমানা। অবশেষে সৌভাগ্যলক্ষ্মী অপমানক্ষুব্ধ শকুন্তলার চরণপতিত অনুতপ্ত দুষ্যন্তকে মিলিয়ে দিয়ে জয় ঘোষণা করলেন প্রেমের। আদর্শপ্রণয় অনেক সংযম-সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার ধন। প্রেমের সেই সাধনায় তপস্বী ও তপস্বিনী—দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে প্রেমের গরিমাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্ক-সংশ্লিষ্ট মুখ্য চরিত্রগুলি অল্প-বিস্তর বিশ্লেষিত হয়েছে। এই অঙ্কে যে সকল গৌণ চরিত্র আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকটি প্রত্যক্ষ চরিত্র, আবার কয়েকটি পরোক্ষে উল্লেখিত চরিত্র নাটকমধ্যে যাঁদের ভূমিকা বিশিষ্ট কিম্বা স্পষ্ট নয়।

গৌতমী—প্রত্যক্ষ চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গৌতমী। চতুর্থ অঙ্কের মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর আবির্ভাব। নাট্যকার তাঁকে দিয়ে বেশি কথাও বলান নি। তবুও তাঁর কথা না বললে চতুর্থ অঙ্কটি বোধ করি অপূর্ণই থেকে যায়।

শকুন্তলা বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ফুলসাজে সাজিয়ে দিতে হবে তাঁকে। প্রিয়সখী অনসূয়া-

প্রিয়ংবদার চিন্তা শকুন্তলার রাজবধূর উপযুক্ত আভরণের জন্য। হঠাৎ প্রচুর ফুল-অলঙ্কার-আভরণ নিয়ে নারদের প্রবেশ। এসব দেখে বিস্মিত গৌতমী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—'বৎস নারদ, কোথা থেকে এসব পেলে? (বচ্ছ নারঅ, কুদো এদং?) উত্তরে ভগবান মহর্ষি কাশ্যপের তপঃপ্রভাবের কথা উল্লেখ করলে তিনি প্রশ্ন করেন—কিং মানসী সিদ্ধী?—এগুলি কি তাঁর মানসসৃষ্ট? — এইভাবে এই প্রথম নাটকে তাঁর অনুপ্রবেশ কৌতূহলী স্বল্পপরিচিতা এক নারীরূপে।

শকুন্তলা-আশীর্বাদ পর্বের সূচনায় মহর্ষি কাশ্যপ আসন্ন কন্যা-বিচ্ছেদের বেদনায় আবেগ বিহ্বল! অনসূয়া-প্রিয়ংবদা তাঁকে ক্ষৌমযুগল পরিয়ে দিলেন। আনন্দোজ্জ্বল চোখে গুরুজনও তাঁকে শেষবিদায় দানের জন্য সমুপস্থিত। এমন সময়ে শকুন্তলাকে গুরুপ্রণামের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'বাছা, ওঁদের প্রণাম করো, আচার পালন করো।' (আআরং দাব পড়িবজ্জসস।) আবার মহর্ষি যযাতি-শর্মিষ্ঠার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে সম্রাটপুত্রের মা হবার আশীর্বাদ করলে তিনিও সেকথার গুরুত্ব অনুধাবন করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন 'প্রভু, এতো কেবল বর নয়, এ আশীর্বাদ।' (ভগবন্, বরো ক্খু, এসো। ণ আসিস্য।) 'শকুন্তলার পতিগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুভঙ্কর হোক' মহর্ষির এই প্রার্থনার উত্তরে কোকিলের সম্মতিসূচক কুহুরব শুনে শকুন্তলাকে নির্দেশ দেন—"বাছা তোমার শুভযাত্রা স্নিগ্ন জ্ঞাতিজন ও তপোবন-দেবতাদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। এঁদেরও তুমি প্রণাম করো।" (জাদে, ণ্ণাদিজণসিণিদ্ধাহিং অণুণ্ণাদগমণাসি তবোবণদেবদাহিং। তা পণম ভঅবদীণং।) এই সকল ঘটনাবৃত্তের মধ্যে গৌতমী চরিত্রের যে দিকটি প্রতিফলিত হয় তাতে বোঝা যায়, তিনি যেন আশ্রমের অপরিহার্য কর্তব্যসচেতন জাগ্রত বিবেক, স্নেহে-মমতায়-করুণায় বিগলিতপ্রাণ এক আদর্শ সন্ন্যাসিনী। মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলাকে পতিগৃহে তাঁর আদর্শ আচরণ বিধি 'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে...' ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল, আদর্শরমণীর কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে গৌতমীরও কিছু বলার থাকতে পারে। তাই আদর্শ নীতিবোধসমুজ্জ্বল উপদেশ দান করেও সে বিষয়ে চূড়ান্ত উপদেশের ভার গৌতমীর উপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো গৌতমীই বা কী বলেন।' (কথং বা গৌতমী মন্যতে।) এর উত্তরে গৌতমী অবান্তর কথাবিস্তার না করে মহর্ষির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন—'এত্তিও ক্খু বহুজনস্স উবদেসো।'—এই এল বধূজনের উপযুক্ত উপদেশ। বাছা, এগুলি সব মনে রেখো। নাটকমধ্যে তাঁর ভূমিকা এখানেই শেষ। এ থেকে তাঁর চরিত্রের অনিষিক্ত কোণগুলি আলোকিত হয়ে যায়। প্রৌঢ়া, ভূয়োদর্শিনী, স্নেহময়ী, মাতৃসমা এই সন্ন্যাসিনী যেন মহর্ষি কণ্বেরই প্রতিচ্ছায়া। আচারদীক্ষা, নীতি-আদর্শ, কর্তব্য ও সংযম-সহিষ্ণুতা সমুজ্জ্বল, স্থিরা-ধীরা-ব্যক্তিত্বময়ী স্বল্পবাক্ এই সন্ন্যাসিনী মহর্ষির মতোই সংসার-বিবিক্ত নির্জন-প্রশান্ত তপোবনের আনন্দরসময় পরিবেশের বাসিন্দা। তিনি যে আশ্রবাসীদের গুরু ও সম্মানার্হা নেত্রীস্থানীয়া তাতে সন্দেহ নেই। সন্ন্যাসধর্মের সঙ্গে গৃহধর্মের অপূর্ব মিলনে তাঁর চরিত্রটিও তাই মহর্ষি কাশ্যপের মতোই সমান শ্রদ্ধার্হ, সমান উজ্জ্বল।

অতঃপর চতুর্থ অঙ্কে ভীড় করেছে কয়েকজন ঋষিকুমার—মহর্ষিশিষ্য শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, বৈখানস গৌতম ও নারদ। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই শার্ঙ্গরব। মহর্ষির অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য এই শার্ঙ্গরব

অনেকটা যেন পরবর্তী কালের ভগবান বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য আনন্দের পূর্বরূপ। যখনই কোনো জরুরী প্রয়োজন, সবার আগে মহর্ষি তাঁকেই স্মরণ করেন এই বলে—'ক্ব তে শার্ঙ্গরবমিশ্রা!? —'শার্ঙ্গরব, তোমরা সব কোথায়?' অনুগত শিষ্যও তৎক্ষণাৎ উত্তরে দেন—'ভগবন, ইমে স্মঃ।'—প্রভু এই যে আমরা। কাশ্যপ তাঁদের বললেন ভগিনী শকুন্তলাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। পতিগৃহগামিনী শকুন্তলা ও গৌতমীসহ যাত্রীদলের প্রধান হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করে মহর্ষি তাঁর উপর যে নির্ভরতা ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ শিষ্যটির চরিত্রমহিমা স্ফুটোজ্জ্বল হয়েছে। সেই উজ্জ্বলতার আরও নিদর্শন আছে শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যের শেষ দিকে। স্নেহে আত্মবিস্মৃত গুরু কাশ্যপকে সচেতন করে এই শার্ঙ্গবর যখন বলেন, 'ভগবন্। উদকান্তং স্নিগ্ধো জনোঽনুগন্তব্য ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরস্তীরম্, অত্র নঃ সন্দিশ্য প্রতিগন্তুমর্হসি। (প্রভু, স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনদের অনুরূপ ক্ষেত্রে জলাশয় পর্যন্ত গমন করা উচিত বলে শুনেছি। তা এই তো সেই সরসীর তীর। তাহলে প্রভু, এখান থেকে আমাদের করণীয় বার্তা নির্দেশ করে আশ্রমে ফিরে যান।)—এই না উপযুক্ত শিষ্যের বোধ। প্রয়োজনের মুহূর্তে জ্বলে ওঠা এবং কর্তব্য যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। আবার আচার্যের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। রাজধানীতে গিয়ে মহারাজা দুষ্যন্তকে কি কি নিবেদন করতে হবে মহর্ষি সেকথা জানিয়ে দিলে বিনীত ভাবে তা পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, 'গৃহীতোহয়ং সন্দেশঃ।'—প্রভু আপনার এই বার্তা গ্রহণ করলাম। গৃহীদের পালনীয় অনেক কথা বলে বিস্ময় উৎপাদন শেষে মহর্ষি যখন তাঁর বাস্তব বোধের প্রসঙ্গে বলেন, 'বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।' অর্থাৎ তারা বনবাসী হলেও লৌকিক বিষয়ের খবরাখবরও রাখেন। তখনও বিনীত শার্ঙ্গরব গুরুর জ্ঞানের প্রসারতার প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে ভোলেন না, জানিয়ে দেন ধীমান গুরুর প্রতি উপযুক্ত শিষ্যের অগাধ আস্থার কথা। 'ভগবন্! ন খলু কশ্চিদবিষয়ো নাম ধীমতাম্!' প্রভু ধীমান ব্যক্তিদের অজানা তো কিছু নেই! এই বিশ্বাস, এই আত্মনিবেদনের মধ্যেই ভারতীয় গুরু-শিষ্য পরম্পরার উজ্জ্বল-সুন্দর আদর্শটি ধরা পড়েছে।

শার্ঙ্গরবের সঙ্গে মহর্ষির আর এক ধীমান শিষ্য শারদ্বতের নাম একই প্রযত্নে উচ্চারিত হলেও নাটকে তার উপস্থিতি নগণ্য। বৈখানস, নারদ, গৌতম প্রভৃতি সম্পর্কেও একই কথা। সুতরাং এই সকল চরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার অবকাশ এখানে নেই।

(খ) দুর্বাসার অভিশাপ : নাট্যগুরুত্ব :

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুষ্যন্তের প্রেমমগ্না আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন অপমানাহত সুলভকোপা ঋষি দুর্বাসা। ইংরেজিতে যাকে বলে Ego বা Self conceit সেই আত্ম অভিমানরূপ এক প্রকার অহঙ্কার যে সদ্যোবিবাহিতা একটি বধূর জীবনে কত ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কারণ হতে পারে তা তলিয়ে দেখার দায় হয়তো দুর্বাসার ছিল না। কেন না অঘটন-ঘটনশীল কূটবুদ্ধিই যে তাঁকে দেব-মানবের কাছে বিশিষ্ট করেছে। 'আ অতিথিপরিভাবিনি!' এই বিস্ময়কর সম্বোধন-বাক্যে যাঁর সর্বনাশের অশনি সংকেত দেওয়া হলো তাঁর

পরিণতি কী মর্মান্তিক, কী করুণ!—"স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ / কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।"—যাঁর কথা চিন্তা করতে করতে তুমি আত্মহারা, তিনি তোমাকে ভুলে যাবেন। পাগল যেমন পূর্বকথা মনে আনতে পারেন না ঠিক তেমনি ভাবেই তিনিও তোমাকে স্মরণ করতে পারবেন না, এমন কি বারবার মনে করিয়ে দিলেও না।

বোঝা গেলো, স্বভাবরুষ্ট দুর্বাসার সংস্কারে কোনো না কোনো ভাবে অপরাধ করে ফেলেছেন শকুন্তলা। ভারতীয় সংস্কারে বধূরমণীর সাংসারিক অবস্থান কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে। পরিবারের সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, অতিথি-অভ্যাগতদের আতিথ্যসেবা, আত্মায়-স্বজন-পরিজন প্রভৃতি সকলের সঙ্গে সংসারের সুখ-দুঃখকে ভাগ করে নেওয়া, আত্মস্বার্থকে বড়ো করে না দেখে অন্যের কল্যাণে সেই স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া প্রভৃতি ভারতরমণীর সাধারণ সংস্কার। সেই সংস্কারকে অবহেলা করলে অপরাধ হয় এবং তার জন্য শাস্তিও ভোগ করতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতিতে এরকম শাস্তির নিদর্শন অপ্রতুল নয়। সুতরাং এই বিচারে অপরাধিনী শকুন্তলার প্রতিদুর্বাসার অভিশাপ স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

কিন্তু একালের বিচারে ঐ পুরানো সংস্কারের গুরুত্ব কতখানি? দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্বমতে, সুতরাং সিদ্ধ। প্রচলিত সংস্কার অনুসারেও দুষ্যন্ত শকুন্তলার বৈধ স্বামী। সেই স্বামী-সংস্কার থেকেই নব-পরিণীতা বধূ শকুন্তলা যদি সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত হয়েই থাকে তাহলে তা কি নিষ্ঠুরভাবে অভিশপ্তা হবার মতো অন্যায়? প্রেমের শক্তিই প্রেমের ধর্ম। সেই ধর্ম যদি মোহগ্রস্ত হয়ে ম্লান হয়ে পড়ে তাহলে কাউকে লাঞ্ছিত করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু শকুন্তলা পতিমোহে আচ্ছন্ন ছিলেন বললে নর-নারীর জীবনে স্বাভাবিক ভালোবাসার ধর্মকে অস্বীকার করতে হয়। সুতরাং একালের দৃষ্টিতে শকুন্তলার আত্মমগ্নতায় পাপের বীজ ছিল না। তাই সামান্য বিচ্যুতির জন্য লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বিধান সমীচীন হয়নি।

তবুও মহাকবি যখন নাটকের মধ্যে এমন একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন, তখন তার সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।—

প্রথমত, কালিদাস যে সম্পন্নকালের পটভূমিকায় নাটকটি রচনা করেছিলেন, তখনকার রক্ষণশীল মূল্যবোধে নারীর সাংসারিক অবস্থানটি সুনির্দিষ্ট ছিল। সেই সুনীতিনিয়ন্ত্রিত সামাজিক অবস্থানে কেবল নারীর ক্ষেত্রেই নয়, স্ত্রী-পুরুষের সকলের ক্ষেত্রেই কোনোপ্রকার কর্তব্যকর্মে অবহেলা স্বধর্ম থেকে এক প্রকার বিচ্যুতি এবং অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হত। সুতরাং শকুন্তলা অপরাধিনী এবং তাঁর শাস্তির বিধান।

দ্বিতীয়ত প্রেম-পরিণয় জীবনে অপরিহার্য হলেও তার জন্যেও নর-নারীকে সংযম-শৃঙ্খলার শাসন মেনে চলতে হয়। যেখানে বেচাল, অসঙ্গতি, সেখানেই শাস্তির বিধান। প্রাচীন ভারতে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, জননীত্ব প্রভৃতিকে পরম মঙ্গলজনক বিষয় বলে মনে করা হত এবং তারজন্য নিয়ম-শৃঙ্খলারূপ কঠো বিধি-বিধান সমাজকে মেনে চলতে হত।

তৃতীয়ত, কালিদাস হয়তো বিশ্বাস করতেন, যা যথার্থ ভালোবাসা তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন। বিচ্ছেদের দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে, দুঃখ-বেদনার কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে প্রেমকে দহনদীপ্ত নিকষিত হেমে পরিণত করতে হয়। দুর্বাসার অভিশাপ বধূ শকুন্তলার আত্মদহন ও সেই দাহ থেকে মুক্তির সোপান তৈরি করে দিয়েছে। শকুন্তলা-দুষ্যন্ত দুজনেরই আত্মশোধনের পথ বাৎলে দিয়েছে ঐ অভিশাপ।

চতুর্থত, স্রষ্টার মানসিকতার সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে দুর্বাসার অভিশাপ ঘটনাটির মধ্য দিয়ে। যে সুনীতি-সুরুচি-সমুজ্জ্বল মঙ্গলময় জীবনের ছবি কবি এঁকেছেন তাঁর সবকটি কাব্যও নাটকের মধ্যে, সেখানে প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণ-সব একাকার হয়ে গেছে। ত্যাগদীপ্ত প্রেমের সুবর্ণকান্তি বাসনামদির প্রেমের জোয়ারকে অতিক্রম করে গেছে। এই স্বর্ণফল দুর্বাসার দান। তাঁর অভিশাপ—'অয়মহম্ ভোঃ', তো আসলে চেতনার জাগরণ, কল্যাণবুদ্ধির আহ্বান, অভিশাপরূপে আশীর্বাদ!

পঞ্চমত, মহাকবি সৃষ্টির দাবিও মেনেছেন। তাই 'নাট্য কৌশলের দিক থেকেও দুর্বাসার অভিশাপের প্রয়োজন ছিল। Dramatic Suspense বা নাট্য-উদ্বেগ গতিকে যেমন ত্বরান্বিত করে তেমনি দর্শকের মনে একপ্রকার সম্ভাবিত-অসম্ভাবিত সংশজনিত রসানুভূতির সৃষ্টি করে। এর ফলে দর্শকের মনে ভাবের উত্থান-পতনে নাটকের গতি অব্যাহত থাকে। দুর্বাসার অভিশাপ সমস্ত নাটকটিকে রহস্যের আবরণে ঢেকে দিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দুষ্যন্ত হারানো আংটি ফেরত পাচ্ছেন ততক্ষণ নাটকের পরিণতি কী, দর্শক অনুমান করতে পারেন না। এই নাটকীয় কৌশল শ্রেষ্ঠ নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। (দ্রঃ মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'-গ্রন্থের 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক অধ্যায় ২সং পৃ. ২২৬-২২৭)

সুতরাং দুর্বাসার অভিশাপ অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের মূলসূত্র বা Key Note। অভিশাপের জন্যই শকুন্তলার আংটি হারানো, দুষ্যন্তের শকুন্তলা বিস্মরণ এবং দুঃখসাধনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলময় উপসংহার—পুত্র সর্বদমনসহ শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মিলন। সুদীর্ঘ সপ্তাঙ্ক পর্যন্ত নাটকের গতিশীলতা ও কৌতূহল সজাগ রাখার অনুকূলে দুর্বাসার অভি শাপ ক্রিয়াশীল থেকে অপাপবিদ্ধ-নির্মল প্রেমসংস্কারকে পরমমূল্য বিভূষিত করেছে। নাটকে অভিশাপ-পর্ব সংযোজনের সার্থকতা এখানেই।

(গ) শকুন্তলা-বিদায় দৃশ্যের রসসৌন্দর্য :

নাটক দৃশ্যকাব্য। প্রত্যেক্ষ ঘটনার সমাবেশ ও তাদের ভাবরসস্নিগ্ধ আস্বাদন নাট্যবোধ ও কাব্যরসের সমন্বয়-সাধক কালিদাস মহাকবি। মহাকবিসৃষ্ট নাটকে তাই নাট্যধর্ম ও কাব্যধর্মের যুক্তবেণী রচিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ঐ দুটি ধর্মকে একই অর্থে গ্রহণ করা হত। কাব্য আর নাটকের মধ্যে সাহিত্যের বিভাজনরেখা ছিল না বলেই হয়তো সেকালের রসবোদ্ধা বলতে পেরেছিলেন—'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।' অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য হল নাটক। আর এরই সূত্রধরে প্রামাণ্য

হিসেবে তাঁরা পরম সমাদরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কথা—

"কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।
তত্র রম্যা শকুন্তলা॥
তত্রৈবাপি চতুর্থোঽঙ্কঃ।
যত্র যাতি শকুন্তলা॥"

সুতরাং বোঝা গেল, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' কালিদাসসৃষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট নাটক এবং এই নাটকের সবচেয়ে রম্য অংশ চতুর্থ অঙ্ক যার মূল বিষয় শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা-উপলক্ষ্যে বিচিত্র সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অনুষঙ্গ। এই অঙ্কটিতেই তপোবন প্রকৃতি তথা বিশ্ববিমোহিনী বহিঃপ্রকৃতি (Nature) ও মানব প্রকৃতি (Human Nature) তাদের হাজারো সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিয়ে ধরা দিয়েছে। মনীষী গ্যেটে (Goete)-এর 'Young years blossoms' অথবা 'Fruits of its decline' অর্থাৎ 'তরুণ বয়সের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল', 'মর্ত্য ও স্বর্গের' সেতু সেতুবন্ধনের পৌড়োক্তি অত্যুক্তি না হয়ে রবীন্দ্র-কথিত 'যথার্থ রসজ্ঞের বিচার' হয়ে থাকলে সেই উপলব্ধির পশ্চাতেও চতুর্থ অঙ্কের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট।

চতুর্থ অঙ্কের উপস্থাপনায় পুষ্পচয়নের অভিনয়নিরত দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আলাপচারিতা। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপনে গান্ধর্বমতে পরিণয় ও তার উত্তরকালীন প্রতিক্রিয়া — সন্তানসম্ভবা প্রিয়সখীর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা—সেই রাজর্ষি কি রাজধানীতে গিয়ে শকুন্তলা বৃত্তান্ত সবভুলে গেলেন! এর সঙ্গে আরও চিন্তার বিষয়, সোমতীর্থ থেকে আশ্রমে ফিরে এসে মহর্ষি যখন প্রিয়সখীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানবেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া কীরূপ হবে! অনসূয়া অবশ্য এই সমস্যার সহজ সমাধান আশা করে বলেছেন—'জহ অহং দেক্খামি তহ তস্স অণুমদং ভবে।' (আমি যা দেখছি, ঘটনাটি তিনি (মহর্ষি) মেনে নেবেন।) নিজের বক্তব্যের অনুকূলে তাঁর যুক্তিটিও চমৎকার—মা-বাবার প্রথম সংকল্প গুণবতী কন্যাকে সুপাত্রস্থ করা। বিষয়টি যদি দৈবই সম্পাদন করে দেন তবে গুরুজন অবশ্যই কৃতার্থ বোধ করেন। এই সব বাস্তব জীবনরসসিক্ত সংলাপে নাটকটি ভাবের স্বাধীন লোক থেকে দর্শক-শ্রোতার মনকে মর্ত্যের মাধুরীমাখা জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

আবার দর্শক যখন একটা মধুর কিছু পরিণাম-প্রত্যাশী তখনই আকস্মিক ভূকম্পনের মতো মহর্ষি দুর্বাসার আবির্ভাব! বাম করতলের উপর মস্তক রেখে চিত্রার্পিতের মতো পতিচিন্তায় আত্মহারা শকুন্তলা। কুটীরপ্রাঙ্গণে কখন যে সুলভকোপা মহর্ষি বারংবার 'অয়মহং ভোঃ!' বলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে চলেছেন, সদ্যোবিবাহিতা শকুন্তলা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেন না। অভিশাপ বর্ষিত হল—আ অতিথিপরিভাবিনি!'...ইত্যাদি। কী নিষ্ঠুর নির্মম সেই অভিশাপ! তাঁর প্রিয়তমই তাঁকে চিনতে পারবেন না! অনেক কষ্টে দুর্বাসার প্রসন্নতা বিধান করে আসন্ন বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার একটা

উপায় হল সত্য, কিন্তু দর্শকের মানসিক আনন্দবোধের উপর প্রচণ্ডচাপ সৃষ্টি হল না কি? এমনি ভাবেই অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে নাট্যকার ললিত ও কঠোরের মিলন সাধন করে নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে গতিশীলতা দান করলেন।

অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়াশ্রিত এই চতুর্থ অঙ্ক। শকুন্তলার বিপ্রলম্ভের স্নিগ্ধতা ও প্রেমতপস্যার গভীরতা প্রকাশের জন্য ললিনীপত্রের আড়ালে অদৃশ্য চক্রবাককে না দেখতে পেয়ে চক্রবাকীর আকুল কান্নার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সখীদের কাছে শকুন্তলার আত্মসান্ত্বনা—'দুক্করং ক্খু অহং করেমি।' তিনি যে বিরহ বেদনাকেও সহনশীল করে নিয়ে দুঃসাধ্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন—এই তাঁর নিজেকে নিজের প্রবোধ দান। এমন মূহূতেই অনসূয়া-প্রিয়ংবদা প্রিয়সখীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁদের যে অহৈতুকী ভালোবাসা বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা মেলাভার। শকুন্তলা-অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অপূর্ব সখীত্বের নিদর্শন 'সখা' শব্দের নিগর্লিত অর্থকে (সমপ্রাণঃ সখামতম্) আরও বেশি অর্থবহ করে তুলল।

কী ঘটনাবহুল বাস্তবরসসৃষ্টিতে আর কী ভাববহুল কাব্যরস সৃষ্টিতে অতুলনীয় এই চতুর্থ অঙ্কটি। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা-শার্ঙ্গবর-শারদ্বত-গৌতমী-কাশ্যপ প্রভৃতি চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই স্বমহিম এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁদের নীতিবোধ, আদর্শ জীবনযাপন প্রণালী, প্রিয়জনের কল্যাণচিন্তা প্রভৃতি বিষয়গুলি নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শকুন্তলাকে ফুলসাজে সাজিয়ে দেওয়া, তপোবন-প্রকৃতির মানুষের মতো আচরণ, তাদের কবোষ্ণ নিশ্বাস যেন কেবল আশ্রমিক পরিবেশকে নয়, সমগ্র তপোবনকে জীবন্ত করে তুলেছে। শকুন্তলার বনজ্যোৎস্না নবমল্লিকার প্রতি ভালোবাসা, মাতৃহারা হরিণশিশুটির প্রতি অত্যন্ত স্নেহ, আসন্নপ্রসবা মৃগীটির প্রতি মমতা প্রভৃতি দৃশ্য সত্যিই মনোরম। শকুন্তলা চলে যাবেন বুঝে যে হরিণশিশুটি পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, লেগে থেকেছিল তার সঙ্গে, কাপড়ের খুঁটধরে টেনেছিল—'কো ণু ক্খু এসো নিবসনে মে সজ্জই।' অথবা আশ্রমের প্রাণ আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—এই দেখে পালিত হরিণ-ময়ূর প্রভৃতি মানবেতর প্রাণীদের খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেওয়ার সেই দৃশ্য!—মৃগের মুখ থেকে খসে পড়েছে দর্ভ, ময়ূর নাচ ভুলে গেছে। গাছ থেকে, লতাবিতান থেকে পাতা খসে পড়ছে যেন অশ্রুবিন্দুর মতো। দুঃখবেদনাতুর এই সকল ঘটনা যেন চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক! এই জন্যই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—'লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ সম্বন্ধ।

কালিদাসের চিত্রাঙ্কন-দক্ষতার অপর একটি অপূর্ব নিদর্শন চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। ক্ষীরবৃক্ষের শান্ত আশ্রয়-ছায়ায় দাঁড়িয়ে মহর্ষি কাশ্যপ শকুন্তলাকে 'শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে।' ....প্রভৃতি বলে গৃহবধূর সেবাধর্মের মঙ্গলজনক দিকটি নির্দেশ করলেন। তারপর গৌতমী-শারদ্বত সকলের সঙ্গে গাছের আড়ালে চলে গেলেন শকুন্তলা। হায়, হায় করে উঠলেন দুই প্রিয়সখী—'হদ্ধী

হদ্ধী, অন্তরিদা সউন্দলা বণরাঈহিং।'—বেদনাদীর্ণ অপূর্ব সে দৃশ্য। এইরূপ ছোটখাটো ঘটনাবলীর মাধ্যমে কালিদাস নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন Detail-এর পরিচয় দান করে।

চতুর্থ অঙ্কের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এর কাব্যসৌকর্য ও রসমাধুর্য। মহর্ষি কাশ্যপের বাণীতে, বিষ্কম্ভকে সুপ্তোত্থিত শিষ্যের প্রভাতের মনোরম বর্ণনায়, তপোবনপ্রকৃতির মানবোচিত আচরণের বর্ণনায় যে সকল অনুপম কাব্যসৌন্দর্য ঝরে পড়েছে তার শেষ পরিচয় মহর্ষির দার্শনিক উপলব্ধিতে—

" অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিত ন্যাস ইবান্তরাত্মা।।"

[কন্যা যেন পরের গচ্ছিত ধন। তাকে তার অধিকারীর হাতে সমর্পণ করে চিন্তামুক্ত আমি পরম সন্তোষ লাভ করছি।] এইভাবে মানবিকবোধে, উপমাঋদ্ধ চিত্রসৌন্দর্যে, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দানে চতুর্থ অঙ্কটি দর্শকের হৃদয়াসন জুড়ে রসেছে।

(খ) চতুর্থ অঙ্কের শ্রেষ্ঠত্ব :

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের বিশ্বজোড়া খ্যাতির সিংহভাগ জুড়ে আছে চতুর্থ অঙ্ক। সেই অঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় দুষ্যন্ত-পরিণীতা শকুন্তলার স্বামী-সন্দর্শনে যাত্রা। শুভবিবাহ শেষে নববধূর পিত্রালয় ছেড়ে স্বামীগৃহে—অতঃপর নিজের আলয়ে যাত্রা অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। এতকালের পরিচিত-পরিজন ছেড়ে যাওয়ার বেদনা এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অনিশ্চয়তা ও সংশয় অবশ্যই নিষ্ঠুর জীবনসত্য এবং এটাই চতুর্থ অঙ্কের উপস্থাপ্য বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কন্যাবিদায় বা অপত্যবিচ্ছেদ—অতি সহজেই দর্শক-শ্রোতার মন অধিকার করে। ভাবাবেগ প্রকাশের উপযোগী ঘটনা-সমাবেশ, পরিচ্ছন্ন ভাষা, প্রকৃতিও মানবসত্তার অভিন্নতা, নাটকীয়তা, কাব্যরস, সৌন্দর্যসম্ভোগ, জীবন অন্বেষা ও দার্শনিক বোধের সমাবেশে চতুর্থ অঙ্কটি সপ্তাঙ্কে সমাপ্ত নাটকটির যে-কোনো অঙ্কের তুলনায় বেশি বর্ণিল, চমকপ্রদ, ঘটনাবহুল এবং সূক্ষ্ম-সংবেদশীল অনুভূতির সুতীক্ষ্ণ বুনোটে উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর।

প্রথমেই ধরা যাক ভাবের কথা। চতুর্থ অঙ্ক মূলত দুটি মুখ্যভাবের সমন্বয়। প্রথমটি সদ্য-পরিণীতা নায়িকা শকুন্তলার বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারজনিত করুণ দীর্ঘশ্বাস এবং দ্বিতীয়টি অবশ্যই পতিগৃহযাত্রাকালীন বিদায় দৃশ্য। দুটি বিষয়ই আমাদের মন কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সভ্য দুনিয়ার সব দেশে ও সব কালে ঐ দুটি বিষয়কে কেন্দ্রকরে রোমান্টিক কাহিনীর বিষামৃত-আশ্রয়ী কাব্য-নাটক-গল্প উপন্যাসরূপ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সুতরাং চতুর্থ অঙ্কের ভাবটি মহৎ এবং হৃদয়গ্রাহী।

দ্বিতীয় কথা—চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু। আপন্নসত্তা শকুন্তলার পতিবিরহে আত্মবিস্মৃতি, প্রিয়সখীর

ভবিষ্যৎ চিন্তায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কাতরতা ও সতর্কতা, দুর্বাসার অভিশাপ, সখীদের উদ্যোগে অভিশাপমুক্তির প্রতিবিধান, সোমতীর্থ-প্রত্যাগত আশ্রমপ্রধান মহর্ষি কাশ্যপের (কণ্ব) কন্যাবিদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ, যজ্ঞীয় পবিত্র সংস্কার পালনশেষে পুষ্পসাজে সজ্জিতা শকুন্তলাকে মধ্যমণি করে গুরুজনদের আশীর্বাদ, কাশ্যপ ও গৌতমীর বিশেষ ভূমিকা, তপোবন-দেবতার উদ্দেশ্যে শকুন্তলার শুভকামনায় মহর্ষির শ্রদ্ধাঞ্জলি, পশুপক্ষী, তরুলতা-জীবজন্তু প্রভৃতি সকলের কাছে আশ্রমের প্রাণপ্রিয়া শকুন্তলার বিদায় প্রার্থনা, মহর্ষিকর্তৃক শকুন্তলাকে জীবন-পরিচালনার উপযোগী উপদেশ এবং সবশেষে মহর্ষি, আত্মীয়স্বজন-পরিজন, সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ও আশ্রমের পশুপাখী সবাইকে কাঁদিয়ে বেদনার্ত শকুন্তলার বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হওয়া এবং মহর্ষির আত্মপ্রবোধ—এই সব বিচিত্র-সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ের সমাবেশ চতুর্থ অঙ্কটিতে মনস্তত্ত্বসম্মত নাটকীয় প্রেক্ষাপট রচনা করে নাট্যমহিমা বর্ধন করেছে। বিষয় গৌরবেও এই অঙ্কটি অতুলনীয়। যে চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের নৈপুণ্য অসাধারণ সেই চরিত্রগুলিও এই অঙ্কে এক ধরনের সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা না থাকলে যেমন শকুন্তলা চরিত্রটি কাঙ্ক্ষিত সম্পূর্ণতা পেতো না। তেমনি শার্ঙ্গরব-শারদ্বত, নারদ-বৈখানস-গৌতম, মা গৌতমীসহ বর্ষিয়সী সন্ন্যাসিনী এবং সর্বোপরি শান্ত পোবন প্রকৃতি না থাকলে সম্পূর্ণতা পেত না মহর্ষি কাশ্যপের চরিত্র। এমন কি প্রাচীন ভারত সংস্কৃতির যে অত্যুজ্জ্বল রূপটি—বিশ্ববন্দিত সেই অরণ্যপ্রকতি ও মানবচিত্তের অদ্বয় সংযোগ সুষমা-কেন্দ্রিত অধ্যায়টিও থেকে যেত সামানুপাতিক হারে অপরিস্ফুট। সুতরাং চতুর্থ অঙ্কটির নাট্যগত প্রয়োজন ও গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নাট্যকার যথেষ্ট সতর্কতা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। নাটক যৌথ শিল্প এবং নাটকের পাত্র-পাত্রী ও তাদের ব্যবহৃত ভাষা অর্থাৎ সংলাপের মাধ্যমে সেই যৌথ শিল্প সফলতা অর্জন করে। নাটকের ভাষা হবে ঝরঝরে পরিষ্কার, উজ্জ্বল, সংকেতময়, তীক্ষ্ণধার এবং শায়কের মতো গতিশীল। পরিবেশ ও চরিত্রগত প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে নাট্যকার যে সংলাপ রচনা করবেন তা কখনো মাত্রাহীন, শ্লথ কিম্বা বিতানিত হবে না। সংলাপ রচনায় এই সংযম ও পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়ে নাটকের ঘটনাপ্রবাহকে প্রত্যাশিত গতিশীলতা দান করেছেন তিনি। যে ভাষায় তিনি তা করেছেন তা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন-মার্জিত-রুচিশীল ও আবেগধর্মী। কী সংস্কৃতে আর কী প্রাকৃতে কখনো ছোট ছোট বাক্যের স্ফটিকঘন সৌন্দর্য, আবার কখনো বা অনতিদীর্ঘ-অনতিহ্রস্ব বাক্যের শিল্পসম্মত প্রয়োগে নাট্য সংলাপের ভাষা হয়েছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। গদ্য ও পদ্য ভাষার সার্থক সমন্বয়ে এক প্রকার 'গাথা ভাষায়' ঋদ্ধ হয়েছে অভিজ্ঞানশকুন্তলার নাট্যভাষা। বিশেষ করে চতুর্থ অঙ্কে সেই গাথা ভাষা বা মিশ্রভাষা-প্রয়োগ নৈপুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় বলেও অঙ্কটি শ্রব্য অথবা দৃশ্য দুই দিকে থেকেই শ্রোতা-দর্শকের মনে দাগ রাখে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাট্যকাব্য। সুতরাং কী নাট্য আর কী কাব্য—উভয় দিক থেকেই সাহিত্যামোদী সমাজে তার আবেদন। গদ্য অথবা পদ্য অথবা গদ্য-পদ্যমিশ্র ভাষায় নাট্যকার আখ্যানবস্তুকে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। যেখানে ভাবটিকে সহজভাবে বললে নাট্যআবেদন কিম্বা নাট্যরস বেশি জমবে

সেখানে মহাকবি সরল গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। আর যেখানে অন্তর্গূঢ় কোনো কোনো আবেগকে রসস্নিগ্ধ প্রকাশরূপদান প্রয়োজন সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন স্পন্দিত ছন্দোময়ীবাণী-ঋদ্ধ, ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্য ভাষা। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-সমাসোক্তি প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে উজ্জ্বল-সুন্দর হয়ে উঠেছে সে কাব্যভাষা। অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের আদ্যন্ত কাব্যভাষার প্রয়োগ সেকালের নাট্যরীতি ও নাট্যভাষার সঙ্গে মানানসই হলেও মনে হয়, নিছক শ্রুতি-নাটক বা Reading Drama রূপেও তা কাব্য ও নাট্যরসলিপ্সু জনসমাজে সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল। চতুর্থ অঙ্কটির শ্রুতিনাট্যগত আবেদন অন্য যে-কোনো অঙ্কের তুলনায় যে বেশিই ছিল—একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কালিদাস প্রকৃতিপ্রেমিক কবি-নাট্যকার। নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সংযোগসূত্রটি তিনি চিনিয়ে দিয়েছেন তাঁর নাটকে। প্রকৃতি ও মানবমনের অভিন্নতা অভিজ্ঞানশকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কে এমন একটি দৃশ্য রচনা করেছে যেখানে কোন্‌টি নিসর্গ-উপাদান আর কোনটি মানুষ চেনা যায় না। প্রকৃতির উপর মানবিকভাব কবি আরোপ করেছেন। ফলে নিসর্গপ্রকৃতি মানবীয় আনন্দ-বেদনামিশ্র রূপ নিয়ে উপস্থিত সেখানে। শকুন্তলাকে পুষ্প আভরণে সাজিয়ে দেবার জন্য চাঁদের মতো উজ্জ্বল-সুন্দর কচি কচি কিশলয়রূপ হাত বের করে ক্ষৌমবস্ত্র-অলক্তক প্রভৃতি দান, বনদেবতাদের অশ্রুবিন্দু, আশীর্বাদ, কোকিলের রব প্রভৃতি এর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুত চতুর্থ অঙ্কটি মহাকবির সৌন্দর্যরস সম্ভোগের অনন্য নিদর্শন। রবীন্দ্র অনুভব দিয়ে বিষয়টির ছেদ টানতে হয়—

> "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা,
> প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য সম্ভোগ।"

মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমিক আবহ, নর-নারী, গাছ-পালা-পশুপাখী-অধ্যুষিত রম্য পরিবেশ, সংযম-সহিষ্ণু নিয়ম-শৃঙ্খলা-আশ্রিত জীবন-অন্বেষার সম্যক পরিচয় দানে চতুর্থ অঙ্কটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। আশ্রমিক জীবনের সংযত-উদার মহিমার সঙ্গে লোকজীবনের মঙ্গলময় বিন্যাস, জগৎও জীবনের শাশ্বত ন্যায়নীতি আদর্শের সঙ্গে প্রেমপ্রীতিরসসিক্ত মানবিক বোধের অপূর্ব সমন্বয় নাটকের চতুর্থ অঙ্কটিকে নাটক হিসেবে কাব্যহিসেবে এবং সর্বোপরি প্রাচীন ভারতসংস্কৃতি-নির্ভর জীবনশিল্প হিসেবে একটি শিষ্ট মাত্রা দান করেছে। এই মাত্রা চূড়ান্ত মহিমা অর্জন করেছে শকুন্তলার তপোবনত্যাগের শেষ মুহূর্তে। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন—

> "কাব্যেষু নাটকং রম্যম্
> তত্র রম্যা শকুন্তলা।
> তত্রৈবাপি চতুর্থোঽঙ্ক
> যত্র যাতি শকুন্তলা।।"

(ঙ) অভিজ্ঞানশকুন্তলা ও রবীন্দ্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের উত্তরসূরী। কালিদাসের কাছে তাঁর সারস্বত ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। মহাকবি কালিদাসকে ধ্যানের আসনে বসিয়েছিলেন তিনি। চৈতালি'র 'মানসলোক' কবিতায় কালিদাসের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"আজিও মানসধামে করিছ বসতি—
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি।"

কালিদাসের উত্তরকালে তাঁর সাহিত্যের "ধ্রুবপথ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো ভারতীয় কবি এতখানি যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি। কালিদাসের সাহিত্যের প্রতি তন্ময় অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের মনে একদিকে যেমন নতুন আলোকে পুরাতনকে গ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছে, অপরদিকে তেমনি কালিদাসের প্রতিভাকে সঠিকভাবে বিচার ও যথাযোগ্য মর্যাদায় নবযুগের সামনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। মাঝখান থেকে আমরা দুই কালের দুই বহুমান্য কবির মনোধর্মগত সাদৃশ্যটুকু অনুভব করতে পেরে ধন্য হয়েছি।" ['রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, পৃ. ১৫৩] এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, "রবীন্দ্রনাথ অলোকসামান্য প্রতিভার দ্বারা কালিদাস থেকে অকুণ্ঠচিত্তে ঋণগ্রহণ করেও তাঁকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। তাঁর চিন্তার মৌলিকতা কখনও অপরের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়নি।" [মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্যে' (২য় সং), পৃ. ১৫৩]

কালিদাস-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটক। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।' রবীন্দ্রনাথ নাটকটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই নাটকের সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত মনোহর শ্লোকগুলির কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। সংস্কৃতের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'র আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল সবার উপরে। আবার পুরো নাট্যাংশের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কটি তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। তিনি বোধ হয় মনে করতেন, "কালিদাসের যা মূলকথা তা ঐ চতুর্থ অঙ্কেই বলা হয়ে গেছে। সেইজন্য এই অঙ্কে বিধৃত কালিদাসের মূলভাবগুলিকে তিনি সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশে তাঁর স্বভাবসুলভ কবিমনের রং লেগেছে।" [পূর্ববৎ মৎপ্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য' (২য় সং) পৃ. ১৫৩।

'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' এবং 'শকুন্তলা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের উপর রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। দুটি প্রবন্ধে কেবল 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটক সম্পর্কেই নয়, সাধারণভাবে কালিদাসের মহত্তম সৃষ্টি সম্পর্কেও তাঁর অনুভবের কথা বলেছেন। মনীষী গ্যেটে নাটকটি সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছিলেন তাকে অভিনন্দিত করে তিনি লিখেছেন, গ্যেটের উক্তি 'আনন্দের অতুক্তি নয় রসজ্ঞের বিচার।' গ্যেটে যে 'ফুল থেকে ফলে পরিণতির' কথা বলেছেন তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, এই পরিণতি

'স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি' এবং এ হল 'প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উন্নীত করিয়া দেওয়া।'

প্রাচীন সাহিত্যের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে বিশুদ্ধ রসদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য প্রবন্ধটিতে নাটকটি সম্পর্কে প্রচলিত অনেক ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে কবি-সমালোচক ও নাট্যরসবোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন আভাষণে ও চিঠিপত্রে তিনি কালিদাসের সাহিত্য বিশেষত অভিজ্ঞানশকুন্তালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে দুর্বাসার অভিশাপের গূঢ়তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর অনুভবে দুর্বাসা কল্যাণবুদ্ধির প্রতীক এবং কালিদাসের সবকটি কাব্য-নাটকে এই কল্যাণবুদ্ধি কাজ করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আপন সৃষ্টির মধ্যে মহাকবি প্রেম-সৌন্দর্য-মঙ্গল-কল্যাণকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে কাব্যে-নাটকে মহৎ আদর্শের জয়গান করেছেন।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নানা স্তরে তিনি এই অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এই সকল ক্ষেত্রে তিনি কখনো মূল বিষয়ের কায়ানুসরণ করেছেন, কখনো বা করেছেন ছায়ানুসরণ। কয়েকটি দৃষ্টান্তে আমাদের বক্তব্য সপ্রমাণ হবে। যেমন 'তপোবন (চৈতালি) কবিতায় প্রাচীন আর্যঋষির তপোবন কবিকে মুগ্ধ করেছে। সেখানে ঋষিকন্যাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে শকুন্তলার সাদৃশ্য-কল্পনা এসে গেছে—

"ঋষিকন্যাদলে
পেলবযৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।"

আবার 'মিলনদৃশ্য' (চৈতালি) কবিতায় তপোবন বালিকা শকুন্তলার সঙ্গে তরুলতা, পশুপাখী, নদ-নদী, বন, নর-নারী প্রভৃতি সকলে মিলে এক করুণ মিলনদৃশ্য ফুটে উঠেছে—

".....যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতে ছিল স্বজনবৎসলা
জন্মতপোবন হতে—সখা সহকার
লতাভগ্নী মাধবিকা, পশুপরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগীগর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে, স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি, পল্লবমর্মরে,
ছলছল মালিনীর জল কলস্বরে;
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর

মঙ্গল বিদায় মন্ত্র গদ্‌গদ্‌গম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলে করুণ ক্রন্দন।।"

—তপোবনের ছায়া-সুনিবিড় শান্তিনিকেতনের সুরভিস্নিগ্ধ ও ভাবঘন এই কবিতাটিতে যেন চতুর্থ অঙ্কের সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও 'কড়ি ও কোমলের হাসি', 'সোনারতরী'র 'নিদ্রিতা', 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'প্রকাশ', 'ক্ষণিকা'র 'সেকাল', 'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেক' প্রভৃতি একগুচ্ছ কবিতায় কবি অভিজ্ঞানশকুন্তলার অনুষঙ্গ এনেছেন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' (প্রাচীন সাহিত্য) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গভীর হৃদয়বত্তার সঙ্গে শকুন্তলার দুই প্রিয়সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রতি মহাকবির উপেক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। মহাকবি কালিদাসের হৃদয়হীনতার এই দৃষ্টান্ত অবশ্যই একালের কবিকে পীড়িত করেছিল। স্বভাবত অনসূয়া-প্রিয়ংবদার প্রতি তাঁর প্রিয় কবির অনাদর কয়েকটি পরিপ্রশ্নকেও উস্কে দিয়েছিল।

পরিশেষে অভিজ্ঞানশকুন্তলার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আমারই পুরানো লেখা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে চাই। " 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে দিক থেকে গভীর যোগ অনুভব করেছিলেন তাহল প্রকৃতির প্রাণবত্তার দিক থেকে যোগ। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে কালিদাস যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তা অনুভব করেছিলেন। এই দিক থেকে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ধরা পড়ে।"* (রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য, ২য় সং. পৃ. ২৩৩)

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৬.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (বর্ণানুক্রমিক)

১। অলঙ্কারচন্দ্রিকা (২য় সং ১৩৬৩)—শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

২। অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৩। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী-১৯৬১)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। আনন্দবর্ধন-প্রণীত ধন্যালোক (বঙ্গানুবাদ, ১ম সং—১৩৬৪)—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কালীপদ ভট্টাচার্য।

৫। উপমা কালিদাসস্য (১ম সং)—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৬। কাব্যজিজ্ঞাসা (বিশ্বভারতী, ১৯৬১)—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

৭। কালিদাসের গ্রন্থাবলী (সমগ্র, বসুমতী সং, ১৩৬০)—সম্পাদনা রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

৮। কাব্যালোক (৩য় সং—১৩৭৩)—সুধীরকুমার দাশগুপ্ত।

৯। কাব্যকৌতুক (১৯৬৩)—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

১০। ক্লাসিক আলোকে রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৮)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

১১। প্রাচীন সাহিত্য (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-১৩৬২)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম ও ২য় খণ্ড সং, ১৩৭১)—জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।

১৩। বঙ্গীয় শব্দকোষ (সমগ্র)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৬৭)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৫। মেঘদূত-জিজ্ঞাসা (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

১৬। রবি-দীপিতা (৩য় সং)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (২য় সং)—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

১৮। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় (২য় সং)—শ্রীক্ষুদিরাম দাশ।

১৯। রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা (১ম সং—১৩৬৮)—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০। রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস (১ম সং)—পম্পা মজুমদার।

২১। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন)—জ্যোতিভূষণ চাকী-অনূদিত।

২২। Aristotle's Poetics–Ed. Bywater.

২৩। An Introduction to Modern Knowledge–Abercrombie.

২৪। Kalidasa (2nd Ed. 1950)–Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

২৫। Kalidasa : A Critical Study (Bharatiya Vidya Prakashan–1977)–A.D. Singh.

৬.১২.৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে কালিদাসের জীবনদৃষ্টির পরিচয় দাও।

৩। 'কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।'—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে উক্তিটির তাৎপর্য বিশদ করো।

৪। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর সাতটি অঙ্কের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কটিকে কেন শ্রেষ্ঠ বলা হয় তা যুক্তি ও দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৫। 'দুর্বাসার অভিশাপ' ঘটনাটিকে 'নাটকের মূলসূত্র' বলা হয় কেন তার অনুকূলে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো।

৬। চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বন করে যে-কোনো দুটি চরিত্রের নাট্যিক প্রয়োজন সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও।—বিদূষক, গৌতমী, শার্ঙ্গরব, দুর্বাসা, অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা।

৭। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে মহর্ষি কণ্ব/গৌতমী/শকুন্তলা/অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। (যে-কোনো দুটি)

৮। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত শকুন্তলা বিদায় দৃশ্যের রসসৌন্দর্য পরিস্ফুট করো।

৯। রবীন্দ্র সাহিত্যে 'আভিজ্ঞানশকুন্তলম'র প্রভাব ও প্রেরণা সম্পর্কে একটি রসঘন নিবন্ধ রচনা করো। (চতুর্থ অঙ্ক অবলম্বনে)

১০। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে তপোবন প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি 'অভিন্নতালাভ করেছে।'—আলোচনা করো।

১১। উদ্ধৃতি-কেন্দ্রিত প্রশ্ন : (দৃষ্টান্ত) কে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছিলেন? কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। (যে-কোনো একটির) অনুরূপভাবে যে-কোনো উদ্ধৃতি তুলে প্রশ্ন থাকতে পারে।

ক) অতি সিণেহো পাবসঙ্কী

খ) বচ্ছে, বীরপ্সবিণী হোহি

গ) যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব।

ঘ) বৎসে! অবৈমেতি তস্যাং সৌদর্যাস্নেহম্।

ঙ) বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্।

চ) নলিণীপত্তন্দরিদং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরটদি। দুক্করং ক্খু অহং করেমি।

ছ) গুরুঅং বি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেদি।

জ) হদ্ধী! হদ্ধী! অন্তরিদা সউন্দলা বণরাঈহিং।

ঝ) অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব...

পর্যায় গ্রন্থ ৪

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস

একক- ১৩

অধ্যায়ের আলোচনা (প্রথম ন'টি)

বিন্যাসক্রম :

৬.৪.১৩.১ : গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ পরিচিতি

৬.৪.১৩.২ : পোয়েটিক্সের প্রথম ন'টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়

৬.৪.১৩.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৪.১৩.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪.১৩.১ : গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচিতি

পাশ্চাত্যে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় গ্রিক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল-কেই পথিকৃৎ মনে করা হয়। তাঁর আগেও যে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কেউ ভাবেননি এমন কথা বলা যায় না, তাঁর গুরু প্লেটো এবং প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের নাম তো করাই যায়, কিন্তু অ্যারিস্টটল-এর মতো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাঁরা কেউ করেননি।

অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন গ্রিসের থ্রেস রাজ্যের অন্তর্গত স্ট্যাগিরা শহরে, ৩৮৪ খ্রি.পূর্বাব্দে। তাঁর পিতা নিকোমেকাস ছিলেন একজন যশস্বী চিকিৎসক। অ্যারিস্টটল যৌবনে সৈন্যবিভাগে যোগ দেন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ও করেন, তারপর বত্রিশ বছর বয়সে (মতান্তরে আঠারো) প্লেটোর কাছে দর্শনশাস্ত্র পড়বার জন্য এথেন্সে যান। প্লেটোর মৃত্যুর পর (খ্রি.পূ. ৩৪৭ সাল) ম্যাসিডোনিয়ায় আসেন এবং গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ৩৩৫ খ্রি.পূর্বাব্দে তিনি এথেন্সে ফিরে এসে 'লাইসিউম' নামে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৩২৩ খ্রি.পূর্বাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

অ্যারিস্টটল-এর গুরু দার্শনিক প্লেটো তাঁর এই শিষ্যকে বলেছেন 'Nous', অর্থাৎ মূর্তিমান মনীষা। তাঁর মতো সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্য অত্যন্ত দুর্লভ। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা তাঁর এই সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের একটি খণ্ডাংশ মাত্র, তিনি জানতেন না এমন কোনো বিষয়ই বোধহয় ছিল না। পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র—সব বিষয়েই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চারশো, যদিও তার খুব অল্পই আমরা হাতে পেয়েছি। যা পেয়েছি তার কয়েকটির নাম করি ঃ

(ক) বিজ্ঞান বিষয়ক : Physics, On the Heavens, Meteorology, Growth and Decay, Natural History, The Parts of Animals, The Movements of Animals, The Generation of Animals.

(খ) তর্কশাস্ত্র বিষয়ক : Categories, Topics, Prior, Posterior, Analysis, Propositions, Sophistical Refutations.

(গ) দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক : On the Soul, Metaphysics.

(ঘ) নীতিশাস্ত্র বিষয়ক : Ethics.

(ঙ) সাহিত্যশিল্প বিষয়ক : Poetics, Rhetorics.

(চ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক : Politics.

পোয়েটিক্স্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলেও এর আয়তন খুবই ছোট। অতি সংক্ষিপ্ত মাত্র ছাব্বিশটি

অধ্যায় এতে আছে। আলোচনাগুলি এত সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় সূত্রাকারে লেখা যে মনে হয় এগুলি যেন বড় আলোচনা করার জন্যে নেওয়া কিছু নোটস্। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন, সেইসব অনুষঙ্গ ধরিয়ে দেবার জন্য নিজের প্রয়োজনেই যেন সেগুলি নোট করে রাখা, তা থেকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার সময় যেন তিনি পাননি। ফলে গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও প্রচুর।

মূল পোয়েটিক্স্ গ্রন্থটি গ্রিক ভাষায় লেখা। আজ পর্যন্ত কত ভাষায় যে বইটির অনুবাদ হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। বাংলায় যে বইগুলি আছে তার বেশিরভাগই ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা। একমাত্র অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশই সরাসরি গ্রিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তা অনুবাদ করেছেন। এর ইংরেজি অনুবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এস. এইচ. বুচারের লেখা 'অ্যারিস্টটলস্ থিওরি অব পোয়েট্রি অ্যান্ড ফাইন আর্ট' এবং ইনগ্রাম বাইওয়াটারের 'অ্যারিস্টটল অন দি আর্ট অব পোয়েট্রি'। বাইওয়াটারের অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় গিলবার্ট মারে বলেছেন, অ্যারিস্টটলের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক এই বইটির দুটি খণ্ড ছিল, প্রথম খণ্ডে ছিল ট্র্যাজেডি ও অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল কমেডি ও অন্য কিছু প্রসঙ্গের আলোচনা। দ্বিতীয় গ্রন্থটি আমাদের হাতে আসেনি।

৬.৪.১৩.২: পোয়েটিক্সের প্রথম ন'টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়

পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে অধ্যায়গুলির কোনো শিরোনাম অ্যারিস্টটল দেননি, আমরাও তাঁর আলোচনাকে ভিত্তি করে যেসব মূল প্রসঙ্গ সেখানে আছে, তাদেরই বিচারবিশ্লেষণ করব। কিন্তু মূল পাঠে ঠিক কী বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, তার একটা ধারণা সকলের থাকা দরকার বলেই অধ্যায়গুলির মূল প্রসঙ্গ একটু জেনে রাখা ভালো।

প্রথম অধ্যায় : শিল্পের স্বরূপ ও কাব্যের লক্ষণ নিয়ে একটি ভূমিকা এবং অনুকরণের মাধ্যম

সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ, অর্থাৎ মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডিথাইরাম্বিক কবিতা ইত্যাদি, সাধারণভাবে এরা সবই অনুকরণ মাত্র। এক রকম বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের পার্থক্য তিনটি দিকে—অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয় এবং অনুকরণের রীতি। পদ্য একটা মাধ্যম মাত্র, পদ্যলেখককে কবি বলা যায় না, কারণ চিকিৎসাশাস্ত্র বা প্রকৃতিবিজ্ঞানও পদ্যে লেখা সম্ভব—লোকে ভুল করে পদ্যলেখককে কবিই বলে। সাহিত্যের কোনো কোনো বিভাগ অবশ্য কয়েকটি মাধ্যমকে মিশিয়ে ফেলে, যেমন কবিতা (ডিথাইরাম্বিক ও গথিক), ট্র্যাজেডি এবং কমেডি—এখানে ছন্দ, সুর, পদ্য মিশ্রিত ভাবে থাকে। শিল্পের মৌলিক পার্থক্য হয় অনুকরণের মাধ্যম পালটালে (এ কথা বলার উদ্দেশ্য, লিখিত ভাষামাধ্যমে হয় সাহিত্য, রঙ-তুলিতে চিত্র, মাটি ও পাথরে ভাস্কর্য ইত্যাদি)।

দ্বিতীয় অধ্যায় : অনুকরণের বিষয়

মানুষই হচ্ছে অনুকরণের বিষয়। মানুষের আচরণের নৈতিক পার্থক্য দিয়েই হয় তাদের মৌলিক ভেদ। যাদের অনুকরণ করা হবে তারা হয় আমাদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর, অথবা নিম্নশ্রেণীর, অথবা ঠিক আমাদেরই মতো হবে। হোমারের চরিত্রগুলি আমাদের চেয়ে উন্নত, হেগেমন আর নিকোকারিচের চরিত্র আমাদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, আর ক্লিওফোনের চরিত্র আমাদের মতোই। এই পার্থক্যটাই ট্র্যাজেডি এবং কমেডির স্বরূপ ঠিক করে—ট্র্যাজেডিতে পাই উচ্চশ্রেণীর মানুষ, কমেডিতে পাই নিম্নশ্রেণীর মানুষ।

তৃতীয় অধ্যায় : অনুকরণের রীতি

অনুকরণের তৃতীয় পার্থক্য, রীতি বা রচনারীতি। কবি বর্ণনার দ্বারা সমস্ত ঘটনা জানাতে পারেন, হোমারের মতো অন্য ব্যক্তির মুখে বর্ণনা দিয়ে বা নিজের মুখেই তা বর্ণনা করে এবং পাত্র-পাত্রীকে দর্শকের সামনে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল ভাবে উপস্থাপিত করে। এর ফলেই কাব্য, নাটক ইত্যাদি শাখা পৃথক হয়ে যায়।

এরপর নাটক, ট্র্যাজেডি ও কমেডির উৎপত্তির সম্ভাব্য ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : কাব্য : সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রধান দুই ভাগ

অনুকরণবৃত্তি মানুষের সহজাত, জীবের মধ্যে মানুষেরই এ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। অনুকৃত বিষয় দেখে আমরা আনন্দ পাই, এমনকি লৌকিক জগতে যা বেদনা দেয় সে সব কার্যকলাপের অনুকরণও আমাদের আনন্দ দেয়। কারণ সেটি দেখা না থাকলে নতুন করে জানার জন্য আনন্দ হবে, আর যদি দেখা থাকেও, তবে তা কত ভালোভাবে নির্মিত, কতটা সুন্দর, এসবের ভাবনাই আনন্দ দেবে। অনুকরণের মতোই সংগতি আর ছন্দবোধও আমাদের সহজাত। এই সহজাত বৃত্তি থেকেই কাব্য সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই কাব্যেরও প্রধান দুটি ভাগ হয়—গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোকের মহৎ ঘটনা নিয়ে লেখা কাব্য এবং লঘু প্রকৃতির লোকের নীচ জাতীয় কার্যকলাপ নিয়ে লেখা কাব্য। প্রথম ধরনের কাব্যের উদাহরণ হোমারের রচনা, ট্র্যাজেডিও একই ধরনের রচনা। দ্বিতীয় ধরনের রচনা ব্যঙ্গ কবিতা ; নাটকের মধ্যে কমেডির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য।

এরপর ট্র্যাজেডির বিবর্তন নিয়ে কিছু তথ্য আছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কমেডির উৎপত্তি এবং ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্যের সঙ্গে তার তুলনা

কমেডি নিম্নশ্রেণীর মানুষের অনুকরণ করে। নিম্ন বলতে বোঝায় হাস্যসম্পদ বা ludicrous আর হাস্যসম্পদ বলতে বোঝায় চরিত্রের একটা ত্রুটি বা অসংগতি (যেটা কমেডিতে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখানো হবে), কিন্তু অপরের পক্ষে যা ক্ষতিকারক নয়।

এরপর আছে কমেডির উৎপত্তির ইতিহাস।

মহাকাব্যের সঙ্গে ট্র্যাজেডির মিল এখানে যে উভয়েই উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের অনুকরণ, অমিল রীতির

দিকে—একটি বর্ণনাত্মক, অন্যটি তা নয়। মহাকাব্যের দৈর্ঘ্য বেশি, ট্র্যাজেডি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (সূর্যের একটি আবর্তনের মধ্যে) সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। মহাকাব্যের সব উপাদান ট্র্যাজেডিতে আছে, ট্র্যাজেডির সব উপাদান মহাকাব্যে নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও উপাদান

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন, বলেছেন তা গুরুগম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তনের, ভাষায় সব রকমের অলংকার থাকবে, রীতি কার্যাত্মক এবং উদ্দেশ্য আবেগের শোষণ করে করুণ ও ভয়ানক রস উদ্রিক্ত করা।

সংজ্ঞার প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন অ্যারিস্টটল।

প্রত্যেক ট্র্যাজেডির ছ'টি অংশ আছে—বৃত্ত, চরিত্র, বচন, চিন্তা, দৃশ্য এবং গান। অর্থাৎ দুটি হল অনুকরণের মাধ্যম, একটি রীতি, তিনটি অনুকরণের বিষয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বৃত্ত বা কাহিনী। মানুষের জীবন বিভিন্ন কাজে কর্মেই প্রকাশিত হয়, কাজেই নাট্যঘটনার গুরুত্ব নাটকে খুব বেশি। তারপরই চরিত্র, কারণ চরিত্রই গুণের আধার। ট্র্যাজেডির জীবন এবং আত্মা যদি হয় কাহিনী বা বৃত্ত, তবে চরিত্রের স্থান দ্বিতীয়। তৃতীয় হচ্ছে চিন্তা অর্থাৎ কী বলা হবে, কী বলা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগত হবে, তা ভেবে ঠিক করে নেওয়া। চতুর্থ হচ্ছে বাচন—শব্দের মধ্য দিয়ে চিন্তার প্রকাশ। গদ্য ও পদ্য দুই মাধ্যমই এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। বাকি দুটির মধ্যে সংগীতের শৈল্পিক মূল্য সবচেয়ে কম। আলংকারিক প্রয়োজনেই সংগীত ব্যবহার করা হয়। দৃশ্যসজ্জা নাটকের অভিনেয়তা এবং দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই বেশি দরকার।

সপ্তম অধ্যায় : বৃত্তের আলোচনা : আয়তন

বৃত্তের আদর্শ গঠন নির্ণয় করতে চেয়েছেন। প্রথমত তার আদি, মধ্য ও অন্ত থাকবে। আদি বলতে বোঝায় যা অন্য কোনো কিছু কারণ থেকে আসেনি, অন্ত বলতে বুঝি যার পর আর কোনো প্রশ্ন (আকাঙ্ক্ষা) থাকে না, মধ্য বলতে বোঝায় যা কোনোকিছুর পরবর্তী এবং কোনোকিছুর পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় কথা, তার মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য থাকতে হবে, নইলে তা সুন্দর হবে না। সজীব দেহের মতোই হতে হবে তাকে। সম্ভাব্যতার সীমা থেকে সৌভাগ্য থেকে দুর্ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখাতে হবে।

অষ্টম অধ্যায় : বৃত্তের আলোচনা : ঐক্য

বৃত্ত বা কাহিনীর ঐক্য বলতে আমরা ঠিক কাজের ঐক্য মনে করি না, কারণ মানুষের জীবনে নানা রকমের কাজ থাকে। আসলে বৃত্তের ঐক্য বলতে বোঝায় কাহিনীর মূল ক্রিয়াগুলি হবে একমুখী। এটা সবচেয়ে ভালোভাবে করেছেন হোমার। তিনি 'অডিসি' রচনা করতে গিয়ে অডিসিউসের সমস্ত অভিযোগের কাহিনী

তাঁর কাব্যে, অন্তর্ভুক্ত করে নেননি। যেসব ঘটনায় কোনো অনিবার্যতা নেই তাদের তিনি বর্জন করেছেন ঘটনাগত ঐক্য বজায় রাখতে গিয়ে।

নবম অধ্যায় : বৃত্তের আলোচনা : কাহিনী সম্ভাব্যতা

কবি কীরকম ঘটনার বিবরণ দেবেন ? যা ঘটে গিয়েছে সবই তাঁর বর্ণনার বিষয় হবে না, যার সম্ভাব্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা আছে তাই তিনি শোনাবেন। সেই জন্যেই ইতিহাসের চেয়ে ঐতিহাসিক কাব্যের মূল্য বেশি—তা সামান্য (universal) এবং আরও দার্শনিক গুণসম্পন্ন।

সব রকম ঘটনার জন্য 'এপেইসোডিক' ঘটনাই সবচেয়ে বর্জনীয়, কারণ তার মধ্যে কোনোরকম বিশ্বাস্যতা থাকে না। শুধু কাহিনীর আয়তন বাড়াবার জন্য তাদের প্রয়োজন হয়। ট্র্যাজেডির ঘটনাগুলি অবশ্য এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে করুণা ও ভীতি দর্শকের মনে সঞ্চার করে। কথাগুলি মনে রাখতে পারলে আদর্শ বৃত্ত গঠন করা সম্ভব হবে।

একক - ১৪

অনুকরণ তত্ত্ব

বিন্যাসক্রম

৬.৪.১৪.১ অনুকরণ তত্ত্ব

৬.৪.১৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৪.১৪.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪.১৪.১ : অনুকরণ তত্ত্ব

অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌সে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুকরণ তত্ত্ব। অনুকরণ তত্ত্ব কথাটি গ্রিক সাহিত্যে তাঁর আগেও অবশ্য প্রচলিত ছিল, তাঁর গুরু প্লেটোও অনুকরণ অর্থেই mimesis শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Art is imitation mimesis'। কিন্তু mimesis শব্দটিকে প্লেটো যে অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অ্যারিস্টটল সে অর্থে প্রয়োগ করেননি। প্লেটোর কাছে এই 'অনুকরণ' ছিল একটা ভাববাদী ধারণা মাত্র, অ্যারিস্টটল তাকে বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্লেটোর ধারণার সঙ্গে তুলনা না করলে অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বের তাৎপর্য বোঝা যাবে না, তাই সেটাই আগে করা যাক।

প্লেটো মনে করতেন আমরা চোখের সামনে যে পৃথিবী দেখছি সেটা একটা অনুকরণ মাত্র, আসল বা 'আইডিয়াল' পৃথিবীর ধারণা রয়েছে ঈশ্বরের মনে। কবিরা সেই 'আইডিয়ালের' যে অনুকরণ চোখে দেখতে পান, তার আবার একটা অনুকরণ করেন। সেইজন্যই আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিদের তিনি নির্বাসিত করতে চেয়েছেন—কবিরা নকলের আবার নকল করে সত্য থেকে অনেকটা দূরে চলে যান।

অ্যারিস্টটল প্লেটোর সেই 'আইডিয়াল'কে স্বীকার করেননি, দৃশ্যমান জগৎকেই তিনি আসল মনে করেছেন। কবিরা এই সৃষ্টির অনুকরণ করতে গিয়ে আর একটা নতুন সৃষ্টি করে ফেলেন, যা আমাদের আনন্দ দেয়। সুতরাং কবিদের তিনি কোনো মতেই নিন্দার যোগ্য মনে করতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, প্লেটো মনে করতেন কেবলমাত্র সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই কবির কর্তব্য, অসুন্দর বস্তুর অনুকরণ করলে তাঁরা নিজেদের মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। অ্যারিস্টটল প্লেটোর এই ধারণাকেও

সমর্থন করেননি, তিনি বলেছেন যা আপাত-অসুন্দর তাও কবির হাতে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেই কারণে কেবল সৎ ও সুন্দর বস্তুর অনুকরণই শিল্পীর কাজ হতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, ভাববাদী ধারণা বর্জন করে শিল্পকলার আলোচনাকে অ্যারিস্টটল বৈজ্ঞানিক ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর আগে শিল্প সম্বন্ধে অনেক ভাববাদী ধারণা প্রচলিত ছিল—ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি করার জন্য আলাদা রকমের প্রতিভার দরকার হয় ইত্যাদি। অ্যারিস্টটল এই সমস্ত ভাববাদকে নস্যাৎ করে, বলতে চাইলেন, প্রত্যেকটি জীবেরই অনুকরণ করবার একটা প্রবণতা আছে, মানুষের এই ক্ষমতা সর্বাধিক—সে অনুকরণ করতে চায় এবং অন্যান্য জীবের চেয়ে ভালো অনুকরণ করে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই সাহিত্য-শিল্পাদির জন্ম, কোনো বিশেষ প্রতিভা বা প্রেরণা থেকে নয়। একেই বলা হয় অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্ব বা mimesis theory। এই তত্ত্বটিকেই তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বোঝা যায় এই একই অনুকরণ প্রবণতা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের জন্ম দেয় এবং বড় শিল্পী ও মাঝারি শিল্পীর তফাত করে দেয়।

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে দেখাতে চেয়েছেন, অনুকরণ প্রবণতা শিল্পের জন্মদাতা হলেও এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পের তফাত হয়ে যায় তিনটি ব্যাপারে—অনুকরণের বিষয়, অনুকরণের মাধ্যম এবং অনুকরণের রীতি। অনুকরণের বিষয় প্রকৃতি হলে তা চিত্রশিল্পের জন্ম দেয়, মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বিষয় মানুষের মনোভাব বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলে তা নৃত্যের জন্ম দেয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব ও মানুষ প্রধান বিষয় হলে সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। মাধ্যমের পার্থক্য গুলিও লক্ষ করবার মতো—চিত্রশিল্পের মাধ্যম রঙ ও তুলি, নৃত্যের মাধ্যম দেহভঙ্গিমা, ভাস্কর্যের মাধ্যম ও উপাদান পাথর, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, উপাদান কাগজ, কলম। রীতি পাল্টালেও শিল্পের প্রকৃতি পাল্টে যায়। সাহিত্য শিল্পেও রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হয়।

এবার অনুকরণ তত্ত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য আমাদের বুঝে নিতে হবে। প্লেটো যে অনুকরণের কথা বলেছেন তা ছিল বিশুদ্ধভাবে imitate করা, অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং—যেমন দেখছ তেমন নকল করো। সত্যের অনুকরণকে বলেছেন eikastike, তা গ্রহণীয় ; মিথ্যার অনুকরণকে বলেছেন phantastike, তা বর্জনীয়। অ্যারিস্টটল কিন্তু mimesis-এর দ্বারা বিশুদ্ধ নকলকে বোঝাতে চাননি। 'মিটিওরলজি' গ্রন্থে বলেছেন, অনুকরণ ঠিক নয়—শিল্প প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, 'পলিটিক্সে' বললেন, প্রকৃতির অপূর্ণতা শিল্প পূর্ণ করে, 'মেটাফিজিক্স' গ্রন্থে বলেছেন শিল্প আর প্রকৃতি হচ্ছে দুই উদ্দীপক শক্তি—প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিল্পের তাগিদ, শিল্পের প্রবর্তনা রয়েছে শিল্পীর হৃদয়ে। 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে তিনি বললেন, কাব্য মানুষ ও মানবিক আচার ব্যবহারকে অনুকরণ করে বটে, কিন্তু তা যান্ত্রিক অনুকরণ মোটেই নয়, আদর্শায়িত অনুকরণ। বাইওয়াটারের অনুবাদে তা এইভাবে বলা হয়েছে—'Imitation is the idealistic representation of universal element in human nature and sight.' আদর্শায়িত অনুকরণ কী, তা জানতে গেলে universal element বা জীবনের সামগ্রিক সত্য কাকে বলে সেটা বুঝতে হবে।

মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে সেই সমগ্র ঘটনা তুলে ধরলেই তা সামগ্রিক ঘটনা হয় না, এবং তা তুলে ধরা সম্ভবও নয়। হোমার তাঁর মহাকাব্যে যুদ্ধের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সব যুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই বলেননি, অথচ জীবনের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কেমন করে হল এটা ! তাহলে universal বলতে কী বোঝান অ্যারিস্টটল, সেটা বাইওয়াটারের অনুবাদ থেকেই জেনে নেওয়া যাক। অনুবাদে পাই—'By the universal I mean how a person of certain type on occation speak or act according to the law of probability or necessity.' অর্থাৎ কিনা এক বিশেষ পরিস্থিতি বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ সম্ভাব্যতার বিষয় ভেবে যে আচরণ করে, তাই হল universal । সম্ভাব্যতার নিয়ম অবশ্য পদার্থশাস্ত্রের বিষয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা ধরে নিতে পারি, একটি চরিত্রের বিশেষ পরিস্থিতির আচরণ যদি সম্ভাব্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তাহলেই তার মধ্যে থাকে একটা শাশ্বত সত্য যাকে আমরা বলি universal বা সার্বজনীন বা সামগ্রিক সত্য। এটাকেই অ্যারিস্টটল যখন বড় করে দেখছেন, তখন আমরা বুঝতে পারি অনুকরণকে তিনি নিছক 'নকল' হিসাবে দেখছেন না, দেখছেন এক শিল্প প্রক্রিয়া হিসাবে। কবি কেবল অনুকরণ করেন না, জীবনের শাশ্বত সত্যে পৌঁছবার জন্য তাকে একটি পন্থা হিসাবে অবলম্বন করেন মাত্র।

কবি যে অসুন্দর ও কুৎসিত ঘটনাকেও অবলম্বন ও অনুকরণ করতে পারেন—মানে প্লেটো 'phantastike' বলে যে অনুকরণ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন, তকেও যে মোটেই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন না অ্যারিস্টটল, তার কারণও ওই সম্ভাব্যতার মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, জীবনের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলবার কাজে যদি তা সহায়তা করে তবে জীবনের অসুন্দর বৃত্তিগুলির অনুকরণও কবি করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন।

বস্তুত প্লেটোর mimesis এবং অ্যারিস্টটলের mimesis-এর মধ্যে মিল শুধু কাজে, দুজনের ধারণায় আছে বিরাট তফাত। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে তিনি গুরুর সংজ্ঞা থেকেই শুরু করেছেন এবং সে কারণে অনুকরণ দিয়েই তাকে আলোচনা আরম্ভ করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর অনুকরণের মধ্যে গ্রহণ, বর্জন, পরিশোধন ইত্যাদি শৈল্পিক ক্রিয়াগুলি আছে—কবি কেবল যান্ত্রিকভাবে জগৎ ও জীবনের নকল করেন, এ কথা তিনি বলেননি। জীবনের এক সামগ্রিক রূপ নির্মাণের অবলম্বন হচ্ছে অনুকরণ, এই হল তাঁর অভিমত এবং তাঁর অনুকরণ তত্ত্বে আমরা পাই একই সঙ্গে শিল্পীর প্রচুর সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা।

একক - ১৫

কমেডি

বিন্যাসক্রম

৬.৪.১৫.১ কমেডি

৬.৪.১৫.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.৪.১৫.৩ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.৪.১৫.১ : কমেডি : সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

অ্যারিস্টটল তাঁর আলোচনায় ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কমেডি নিয়ে কোনো পৃথক অধ্যায় তিনি রচনা করেননি। বাইওয়াটারের অনুবাদের ভূমিকায় অবশ্য গিলবার্ট মারে বলেছেন অ্যারিস্টটলের এই গ্রন্থের দুটি খণ্ড ছিল, যার প্রথম খণ্ডই শুধু আমাদের হাতে এসেছে, দ্বিতীয় খণ্ডে নাকি

কমেডির বিস্তৃত আলোচনা ছিল। কিন্তু যা হাতে পাইনি সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা সমীচীন নয়। প্রথম খণ্ড থেকে মনে হয়, কমেডিকে তিনি অন্তত ট্র্যাজেডির মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। তবে বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি কমেডি সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন, তা থেকে কমেডির প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমরা বুঝতে পারি এবং এর কী সংজ্ঞা তিনি নির্ধারণ করতে চান, তাও অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

অ্যারিস্টটল কমেডির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাননি, কাজেই ঠিক কখন এক বিশেষ ধরনের নাট্যকলা হিসাবে কমেডি আত্মপ্রকাশ করেছে তা সঠিক ভাবে বলা শক্ত। 'কমেডি' শব্দের উৎপত্তি গ্রিক ভাষায়, এর ধাতুগত অর্থ আমোদকারীর গান। ডোরীয়দের দাবি, ট্র্যাজেডি এবং কমেডি দুয়েরই আবিষ্কর্তা তারা। গ্রিসের মেগারীয়রা বলেন কমেডির শিল্পরূপ নাকি তাঁদেরই উদ্ভাবনা। আবার সিসিলির মেগারীয়রা বলেন তাঁদের পাশের গ্রামের নাম 'কোমাই', পুরো নাম 'কোমাইজেন' থেকেও কমেডিয়ান শব্দটি আসা সম্ভব। প্রাচীন কমেডি রচয়িতা এপিকারসাস যখন নিজে ছিলেন সিসিলির লোক এবং মেগারীয়, তখন তাঁদের এ দাবি সত্য হতেও পারে। কমেডির উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, এর সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অভিমত এবার জেনে রাখা যাক।

পোয়েটিক্স্ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের একেবারে গোড়াতেই অ্যারিস্টটল কমেডির একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। তাকে বিশ্লেষণ করলেই কমেডির প্রকৃতি সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মনোভাব ও ধারণা বুঝতে পারা যাবে। বাইওয়াটারের অনুবাদে এই সংজ্ঞা এই রকম : 'As for Comedy, it is (as has been observed) an imitation of men worse than the average ; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others.'

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা কমেডি জাতীয় নাটকের প্রকৃতিকে অনেক স্পষ্ট করে তুলতে পারে। এর আগে প্লেটো তাঁর 'ফিলেবাস' গ্রন্থে কমেডির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে তাকে এর চেয়ে অনেক নিম্ন ধরনের শিল্প বলেই মনে হয়েছিল। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় জীবন ও আচরণের কোনো একটা অসংগতি যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে, তখনই কমেডির আনন্দ মনে জাগে। এই অসংগতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অ্যারিস্টটল মোটেই বেদনাদায়ক বা ক্ষতিকর মনে করেননি।

আসলে পৃথিবীর সব মানুষই তো প্রতিভাবান বা সচেতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেন এমন স্থূলবুদ্ধি মানুষও আছেন। এই ভুল ধারণা থেকেই আচরণে বা কথাবার্তায় অসংগতি দেখা যায়। ক্ষমতাবান কমেডি লেখক এই আচরণকে ছোটখাট বিচ্যুতি বা কথাবার্তায় সামান্য অসংগতিকেই অতিরঞ্জিত করে দেখান। এই অতিরঞ্জনের উদ্দেশ্য তাঁকে হেয় করা নয়, দর্শকদের সঙ্গে নির্মল আনন্দ উপভোগ করা। এভাবে আনন্দ দেবার জন্যেই সম্ভবত আগে কমেডি নাটকের অভিনেতারা মুখে অদ্ভুত কিছু মুখোশ পরতেন। সার্কাসের ক্লাউনরা আজও মানুষকে হাসাবার জন্য মুখোশের ব্যবহার করেন।

তবে দৈহিক অসংগতি বা বাহ্যিক অসংগতির চেয়ে চরিত্রগত অসংগতিই যে কমেডির প্রাণ, সেটা অ্যারিস্টটলের বিক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যায়। কমেডির সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন পঞ্চম অধ্যায়ে, কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়েই চরিত্রচিত্রণের রীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কমিক্যাল চরিত্রের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষকে চিত্রিত করা যায় তিন ভাবে—সে যেমন তার চেয়ে উন্নত রূপে, যথাযথ রূপে, অথবা সে যেমন তার চেয়ে একটু হেয় রূপ দিয়ে। এই তৃতীয় প্রকারের রূপদানই কমেডি-লেখকের বৈশিষ্ট্য। মানুষের বিকৃতি ও অসংগতি অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরে বলেই তাকে হেয় মনে হয়।

এখানে একটা অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি করেছেন অ্যারিস্টটল যা থেকে তাঁর চিন্তার গভীরতা আমরা বুঝতে পারি। চরিত্রের এই অসংগতিকে তিনি শুধু কমেডির বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেননি, তিনি বলেছেন এটি ট্র্যাজেডিরও বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার ঠিক কীভাবে এই অসংগতিকে দেখাচ্ছেন তার ওপরই নির্ভর করে এটি কী ধরনের নাটক হয়ে উঠবে। চরিত্রের অসংগতি যখন আমাদের মধ্যে দুঃখের উদ্রেক করে, করুণা ও ভীতি দ্বারা আমাদের অভিভূত করে ফেলে, তখনই জন্ম হয় ট্র্যাজেডির। পক্ষান্তরে এই অসংগতি যখন দুঃখের কারণ হয় না উপরন্তু আনন্দের খোরাক হয়, তখনই তা হাস্যরসাত্মক কমেডি হয়ে উঠতে পারে। ট্র্যাজেডি ও কমেডির তুলনা করতে গিয়ে কার্যত অ্যারিস্টটল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে এই শ্রেণীর নাটকের পার্থক্য সূচিত হয় অসংগতির মাত্রার ওপর।

কমেডির চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য অ্যারিস্টটল করেছেন, এবং তা কতখানি সত্য, আজ প্রত্যেকেই আমরা তা জানি। ব্যক্তিচরিত্রকে কমেডি-লেখকরা শ্রেণীচরিত্রে (অর্থাৎ type character-এ) পরিণত করে তোলেন। কিন্তু ট্র্যাজেডির লেখক চান ব্যক্তিকেই একটি শ্রেণীর প্রতিভূ করে তুলতে। কবে অ্যারিস্টটল এ কথা বলেছেন কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কমেডি রচয়িতাদের এই প্রবণতা আমরা লক্ষ করি। কথাটি বাইওয়াটারের অনুবাদে এইভাবে আছে :

'Comedy tends to merge the individual in the type, tragedy manifests the type through the individual.'

অ্যারিস্টটল কমেডি নিয়ে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করেননি বলে সেভাবে তার কোনো শ্রেণীবিভাগও করেননি। কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি কমেডি সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করেছেন তার সাহায্যেই ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য একটি ছকের সাহায্যে এই শ্রেণীবিভাগ করে দেখিয়েছেন। সেটি এই রকম :

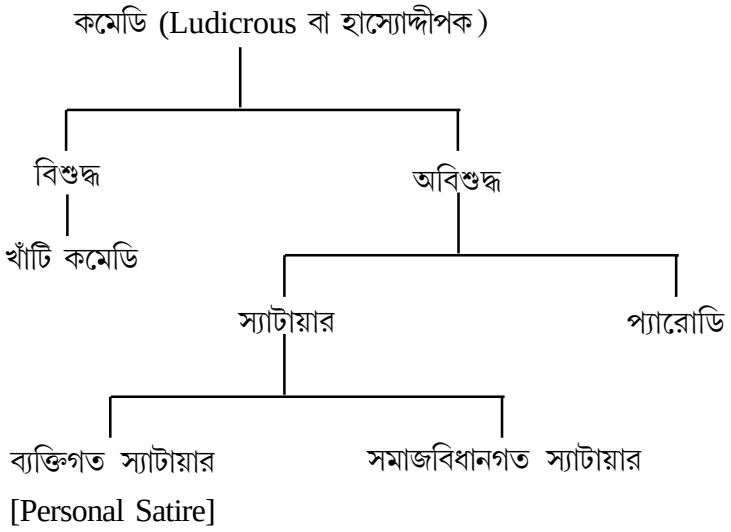

সমাজবিধানগত স্যাটায়ার বা Social Satire-এর নাম অ্যারিস্টটল কোথাও উল্লেখ করেননি, কিন্তু স্যাটায়ারের প্রকৃতিগত বিভাগ করতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বলেছেন, তা থেকেই ড. ভট্টাচার্য নামটি গঠন করেছেন।

একক - ১৬

ট্রাজেডি

বিন্যাসক্রম

৬.৪.১৬.১ ট্রাজেডির সংজ্ঞা
৬.৪.১৬.২ ট্রাজেডির শ্রেণিবিচার
৬.৪.১৬.৩ ট্রাজেডির বিষয়বস্তু
৬.৪.১৬.৪ ট্রাজেডির উপাদান
৬.৪.১৬.৫ ট্রাজেডির নায়ক
৬.৪.১৬.৬ ট্রাজেডির মূল রস
৬.৪.১৬.৭ ক্যাথারসিস বা চিত্তশুদ্ধি
৬.৪.১৬.৮ মহাকাব্য: ট্রাজেডি সঙ্গে তার তুলনা
৬.৪.১৬.৯ ইতিহাস ও কাব্যের তুলনা
৬.৪.১৬.১০ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি
৬.৪.১৬.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.৪.১৬.১ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা

পোয়েটিক্‌স্ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রায় সম্পূর্ণ ট্র্যাজেডির আলোচনা। সেখানে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তা যে অভ্রান্ত আছে তাই শুধু নয়, ট্র্যাজেডি নিয়ে দীর্ঘকাল এত বিখ্যাত মানুষের এত সমৃদ্ধ আলোচনার পরও তার মূল্য এতটুকু কমেনি। আজও ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনায় সমস্ত পৃথিবীর সমালোচক এই সংজ্ঞাটিকে স্মরণ করেন।

বাংলায় সাধারণভাবে ট্র্যাজেডি নাটককে আমরা বলে থাকি বিয়োগান্ত নাটক, কারণ প্রায়ই এই জাতীয় নাটকের শেষে একটি বিয়োগ বা মৃত্যুর ঘটনা থাকে। কিন্তু ট্র্যাজেডির পক্ষে মৃত্যু অপরিহার্য নয়, এবং মৃত্যু থাকলেই তা ট্র্যাজেডি হয় না। বাংলায় এই জাতীয় নাটককে বরং বিষাদান্ত নাটক বলা যেতে পারে। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব সমস্ত দিক বিচার করে কীভাবে তিনি এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

সংজ্ঞাটি বাইওয়াটারের অনুবাদে এইরকমভাবে পরিবেশিত হয়েছে :

‘A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, where with to accomplish its catharsis of such emotions.’

সংজ্ঞাটি বড়ো, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে ট্র্যাজেডির যে লক্ষণগুলির কথা বলা হয়েছে তার কোনোটাই তাৎপর্যহীন নয়। যে লক্ষণগুলির কথা আছে, তার উল্লেখ করলেই সে কথা বুঝতে পারা যাবে—

(ক) ট্র্যাজেডি হবে বেশ গুরুগম্ভীর বা serious ঘটনার অনুকরণ।

(খ) ট্র্যাজেডির বেশ কিছুটা আয়তন থাকতে হবে (magnitude) এবং তাকে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ (complete in itself)।

(গ) ট্র্যাজেডির ভাষা হবে সমস্ত রকম কাব্যিক অলংকার যুক্ত এবং সেটা নাটকের একটা অংশে রাখলেই হবে না, নাটকের প্রত্যেক অংশেই সেই অলংকার এর ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) ঘটনাগুলির বর্ণনা গেলেই হবে না (not in a narrative form), সেগুলি দেখাতে হবে নাটকীয় রীতিতে, (dramatic form) অর্থাৎ ঘটনা যেমনভাবে ঘটছে সেইভাবেই দেখাতে হবে।

(ঙ) নাট্যকাহিনী এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং সাজাতে হবে যাতে তা দেখে আমাদের মনে করুণা এবং ভীতি (pity and fear) জেগে ওঠে।

(চ) রস পরিণতিতে যেন এই দুই বৃত্তির শোধন বা পরিশুদ্ধি হয়, (catharsis) সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল তার বিষয়বস্তুর কথা (ক) মনে রেখেছেন, তার আঙ্গিক কেমন হবে (খ, গ) সে ব্যাপারে প্রত্যেকটি অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন, লক্ষ রেখেছেন তার নাটকীয়তার (ঘ) প্রতি, রস পরিণতির কথা (ঙ) ভেবেছেন এবং একেবারে ট্র্যাজিক সংবেদনের মূল তাৎপর্যটিও (চ) ধরবার চেষ্টা করেছেন।

অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় যে-ক'টি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই বিস্তৃত ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গই সমালোচকগণ ও সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং তা সত্ত্বেও এমন প্রসঙ্গ আছে যেখানে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বলতে চেয়েছেন তার মীমাংসা আজও হয়নি। সুতরাং সেইসব সূক্ষ্মতায় না গিয়ে মোটামুটি ভাবে আমরা লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

(ক) ঘটনা নির্বাচনের ব্যাপারে নাট্যকারকে প্রথমেই সতর্ক হতে হবে। ঘটনার প্রকৃতি যদি গুরুগম্ভীর না হয় তবে সেই ঘটনা ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। কোনো লঘু ঘটনা দিয়ে ভালো ট্র্যাজেডি রচনা করা সম্ভব নয়, সে বিষয়ে নাট্যকারকে অবহিত থাকতে হবে।

(খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বলতে কী বোঝায় সে কথা অ্যারিস্টটল এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন— যে কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত আছে, অর্থাৎ প্রথম থেকেই যে নাট্যকাহিনীর সূচনা করা হচ্ছে এবং শেষ হবার পর আর কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা যেখানে থাকবে না, অর্থাৎ কোনো কাহিনীগত অতৃপ্তি নিয়ে নাটক শেষ হবে না।

(গ) অ্যারিস্টটল যেসব ট্র্যাজেডি দেখেছেন তাদের ভাষা জাঁকজমকপূর্ণ এবং আলংকারিক ছিল বলেই ভাষা তিনি সর্বত্র আলংকারিক হতে হবে বলেছেন। আসলে একটু উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনচিত্র বলেই সংলাপে তার উপযুক্ত ধ্বনিগাম্ভীর্য তিনি প্রত্যাশা করেছেন। যুগে যুগে এর ধারণা অবশ্য পালটায় এবং তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের আদর্শ অবলম্বন করেছে, এ কথা এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

(ঘ) নাটকের একেবারে মূল সত্যটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। নাটক বর্ণনামূলক কাব্য নয়, ঘটনামূলক কাব্য। কাজেই নাটক মাত্রেই ঘটনার বর্ণনার পরিবর্তে ক্রিয়াত্মক ঘটনার প্রত্যক্ষ উপস্থাপন বেশি কাম্য, বিশেষ করে ট্র্যাজেডিতে নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘটনার উপস্থাপন একেবারে অনিবার্য। সেভাবে উপস্থাপিত করতে না পারলে ট্র্যাজেডির প্রত্যাশিত সংবেদন নাটকে আমরা লাভ করতে পারব না।

(ঙ) Pity and fear বা করুণা ও ভীতি নামক দুটি মনোভাবের জাগরণ না ঘটলে যে ট্র্যাজেডির নাট্যকাহিনীর কোনো সার্থকতা থাকে না সে কথা অ্যারিস্টটল বলেছেন এবং পরবর্তী প্রায় সমস্ত নাট্যতত্ত্ববিদ এ কথা সমর্থন করে নিয়েছেন। করুণা বা সহানুভূতি জাগতেই হবে, নইলে যার বিষাদান্ত পরিণতি নাটকে দেখানো হচ্ছে, সেই চরিত্রের প্রতি দর্শক সম-মনোভাবসম্পন্ন হতে পারেননি, এটাই বলতে হবে। ভীতিও অবশ্যই থাকবে, এবং সেটা এই কারণেই যে, একজন এই রকম উচ্চশ্রেণীর মানুষের জীবনেই যদি এই বিষাদ নেমে আসতে পারে, আমরা কেউই তো তাহলে সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। তবে এই ভীতি (fear) যেন প্রবল মাত্রায় ভয়ঙ্কর (horror) হয়ে না ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(চ) Catharsis বা চিত্ত পরিশুদ্ধির ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা এটাই ধরে নিতে পারি যে একটি মহৎ জীবনের বিষাদ দেখেও যে আমরা এক ধরনের আনন্দ লাভ করি, তার কারণই হল এই চিত্ত পরিশুদ্ধি। এটা হয় বলেই ট্র্যাজেডিও (অর্থাৎ বিষাদান্ত নাটক) আমাদের আনন্দ দেয়।

৬.৪.১৬.২ : ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিচার

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে কতরকমের ট্র্যাজেডি হতে পারে, সে আলোচনাও করেছেন। পরবর্তীকালে এই বিভাগের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকরকম সমালোচনা হয়েছে, সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাথমিক একটি শ্রেণীবিভাগ যে তিনি অনেক আগেই করে দিয়েছেন এবং আজও যে তা স্মরণ করার প্রয়োজন রয়েছে, এটাই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি মোট চার প্রকারের—Complex বা জটিল, Pathetic বা বিষাদমূলক, Ethical বা নীতিমূলক এবং Simple বা সরল। তিনি ট্র্যাজেডির আলোচনায় 'Spectacular' শব্দটা গ্রিক ভাষায় অনেকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু লক্ষণীয় হল spectacular বা দর্শনীয় কোনো ট্র্যাজেডির শ্রেণী তিনি নির্দেশ করেননি।

বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি বলতে অ্যারিস্টটল বুঝিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি অর্থাৎ জটিল ট্র্যাজেডিকেই। ট্র্যাজেডির রসপরিণতিতে করুণা ও ভীতি নামক দুটি চিত্তবৃত্তি থাকে এ কথা তিনি আগে বলেছেন, কিন্তু জটিল ট্র্যাজেডিতে থাকে অধিকন্তু অদ্ভুত রস। প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্রে বলা হয়েছে বিস্ময় নামক স্থায়ীভাব থেকেই অদ্ভুত রসের সৃষ্টি। ট্র্যাজেডি যাঁরা রচনা করেন তাঁদের বিস্ময় সৃষ্টি করার দুটি পন্থা আছে—পরিস্থিতি বিপর্যয় (ইংরেজিতে বললে Reversal of situation) এবং প্রত্যভিজ্ঞান (ইংরেজিতে বলা হয়েছে Recognition)। এই দুটি পন্থা কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় বলেই এই ধরনের ট্র্যাজেডিতে 'awe and grandeur' থাকে বেশি, এবং সেই কারণেই এই শ্রেণীর নাটককেই শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সম্মান দেওয়া যায়। অ্যারিস্টটল এই ধরনের ট্র্যাজেডির সার্থক উদাহরণ মনে করেছেন 'ঈডিপাস দি রেক্স্'-কে। কারণ এখানে ভয় এবং করুণার সঙ্গেই বিস্ময় অসাধারণভাবে সংমিশ্রিত হয়ে আছে। এদের মিলিত সংবেদন দর্শককে অভিভূত করে।

প্যাথেটিক বা বিষাদমূলক ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নানা ধরনের সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 'প্যাথেটিক' এবং 'ট্র্যাজিক'। এই দুটি শব্দই মূলত একই জিনিস বোঝায়, কাজেই একটি শব্দ আর-একটি শব্দের শ্রেণী বোঝাতে পারে না। আবার অন্য কেউ-কেউ এমন কথা বলেছেন যে, যা প্যাথেটিক অর্থাৎ আমাদের চূড়ান্ত ভাবে বিষণ্ণ করে তোলে, তাকে ট্র্যাজেডি বলাই যায় না, কারণ ট্র্যাজেডি বিষাদান্ত হলেও তা দেখে আমরা আনন্দ পাই।

অ্যারিস্টটল নাটকের এই শ্রেণীটি নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন এবং সেগুলি থেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয়। তবু আমরা নিজেরাই যদি এর উত্তর সন্ধান করতে চাই তাহলেও এর সমাধান খোঁজা কষ্টকর নয়। 'ট্র্যাজিক' একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংবেদন যার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক সংবেদন, 'প্যাথেটিক' তার একটা মাত্র। তাছাড়া অতিরিক্ত pathetic হলেই তার ট্র্যাজিক আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়, এ কথাও বোধহয় সত্য নয়। এর উদাহরণ সব সাহিত্যেই আছে—'নীল দর্পণ' বা 'ম্যাকবেথ', কিংবা এ কালের 'মাটির ঘর' (বিধায়ক ভট্টাচার্য)-ও তার উদাহরণ। অ্যারিস্টটল তাঁর সময়ের দুটি নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—Ajax এবং Ixion । 'Mad-brained error'-এর ফলে আয়াস যে দুর্নাম ও ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হন, মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও ভয়ংকর যে যন্ত্রণায় তিনি দগ্ধ হতে থাকেন, সেটাই প্রথম নাটকের বিষয়বস্তু। কিন্তু তা সত্ত্বেও—আয়াসের প্রচুর বিক্ষোভ ও বিলাপ থাকলেও (আমাদের মনে পড়তে পারে 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের বারংবার বিলাপ 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল') ট্র্যাজিক সংবেদনে তা বাধা দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

আর একটি কথা। Pathetic নাটকের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে, অ্যারিস্টটল বলেছেন 'where the motive is passion'। সুতরাং passion বা চিত্তসংক্ষোভকে প্রাধান্য দেওয়াটাই যেখানে মুখ্য, সেখানে আবেগের কিছু বাড়াবাড়ি হতেই পারে। সে কারণে তার ট্র্যাজিক মর্যাদার হানি করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

ট্র্যাজেডির তৃতীয় শ্রেণীটিকে অ্যারিস্টটল বলেছেন, নীতিমূলক নাটক। এর জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'where the motives are ethical'। নাম শুনেই বোঝা যাবে, এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডিতে উপস্থাপিত হয় কোনো নৈতিক সমস্যা। এই নৈতিক সমস্যা অবশ্য কোনো নাটকীয় সংঘাত তৈরি করতে পারে কিনা, এর ফলে ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কিনা সেসব অবশ্য নাট্যকারকে ভেবে দেখতে হবে। নীতিমূলক ট্র্যাজেডিকে খুব সাধারণভাবে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে উচ্চ শ্রেণীর নাটক বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর নাটক থেকেই উদ্ভব ঘটেছে Tragedy of Character-এর, এ কথা স্মরণ রাখলে তার উৎস হিসাবে নীতিমূলক নাটককে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করতে পারি না। শুধু তাই নয়, এর পর ভাবমূলক নাটক, দিদরো যাকে বলেছেন Drama of ideas এবং আরও আধুনিক কালে সাঙ্কেতিক নাটকের উদ্ভবের সঙ্গেও এই শ্রেণীটির একটা যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাব।

সরল ট্র্যাজেডি নামে যে শ্রেণীটি নির্দেশ করেছেন অ্যারিস্টটল, তার সারল্য বিষয়ে ততটা না, যতটা তার গঠনে। একটি সহজ সরল কাহিনীর একমাত্রিক বিন্যাসই এই ধরনের নাটকের বৈশিষ্ট্য। রসপরিণতির কথা ভেবে করুণা ও ভীতি উদ্রিক্ত করার আয়োজন এখানে থাকে, কিন্তু পরিস্থিতি বিপর্যয় বা প্রত্যভিজ্ঞানের দ্বারা বিস্ময় সৃষ্টির চেষ্টাও যেমন এখানে থাকে না, তেমনি থাকে না জটিল নাটকের বর্ণাঢ্যতা ও ঘটনার ঘনঘটা, যাকে পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে বলা হয়েছে 'awe and grandeur'। সব সময় ঘটনাধারার মধ্যে সম্ভাব্যতাও হয়তো বজায় রাখার দিকে সতর্ক থাকেন না নাট্যকার, তা সত্ত্বেও এরকম নাটক কিন্তু দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

ট্র্যাজেডি নাটকের নানারকম শ্রেণীর কথা পরবর্তী নাট্যতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, কিন্তু প্রাথমিক যে শ্রেণীবিভাগটি অ্যারিস্টটল করে দিয়েছিলেন, তার গুরুত্ব ও মূল্য আমরা মোটেই অস্বীকার করতে পারি না।

৬.৪.১৬.৩ ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু

ট্র্যাজেডি ঠিক কী ধরনের নাটক, সে বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট থাকলেই বোঝা যায়, এর বিষয়বস্তু কী রকম হবে। ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ এখন পর্যন্ত লেখা হয়েছে, কিন্তু খুব সামান্য কথায় ট্র্যাজেডির প্রকৃতি এবং তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা অ্যারিস্টটল তাঁর ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রন্থটিতে দিয়েছিলেন, সেই কথাক'টির মূল্য এখনও স্বীকার করতে হচ্ছে প্রত্যেকটি নাট্যতত্ত্ববিদ্‌কে।

মাত্র দুটি শব্দে ট্র্যাজেডির প্রকৃতি পরিস্ফুট করেছিলেন অ্যারিস্টটল—অপ্রাপনীয় ভাগ্যবিপর্যয়, বা unmerited misfortune। ট্র্যাজেডি কোনো এক ব্যক্তির ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী এবং সেই ভাগ্যবিপর্যয়কে হতে হবে অবশ্যই অপ্রাপনীয় যা তার অদৃষ্টে ঘটবার কথা নয়। কোনো নরঘাতক পাষণ্ড বা অপরাধীর ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয় না, দুই শত্রুর মধ্যে সংগ্রামে যখন একজন আহত বা নিহত হন, তাকেও অভাবনীয় বলে আমাদের মনে হয় না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যার জীবনে এমন শোচনীয় আঘাত বা বিপর্যয় নেমে আসতে পারে, এমনটা মনেই করা যায় না, তার জীবনেও যখন চরম বিপর্যয় আমরা চোখের সামনে দেখি তখনই ঘটে সেই রসসংবেদন যাকে বলে ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দিষ্ট রসাবেদন—'the circumstances which strike us terrible or pitiful'।

ভাগ্যবিপর্যয় অপ্রত্যাশিত কখন হয় তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন ভাই যখন ভাইকে হত্যা করে, পুত্র যখন পিতাকে বা পুত্র মাতাকে হত্যা করবার নেশায় মেতে ওঠে, কিংবা এইরকমই অতি প্রিয় দুটি মানুষ একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রবল চক্রান্ত করতে থাকে এবং পরিশেষে সফল হয় তখন একজনের ভাগ্যবিপর্যয় হয়ে ওঠে শোচনীয় এবং একান্তভাবেই অপ্রাপনীয়। ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যিনি সন্ধান করবেন তাঁকে এই ধরনের ঘটনাই অবলম্বন করতে হবে নাট্যকাহিনীর জন্য।

ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু হিসাবে এই ধরনের ঘটনাকেই উপজীব্য মনে করেন অ্যারিস্টটল, কারণ এইরকম সব পরিস্থিতিতেই মানুষের শুভবোধ, কল্যাণবোধ, মূল্যবোধ এবং যাবতীয় কোমল বৃত্তি আলোড়িত হবার সুযোগ পায়। মানুষ যেখানে সামান্য উপলক্ষের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অতি তুচ্ছ লাভের জন্য তার মানবিকতাকে বিসর্জন দেয়, সেখানেই তার প্রতি আমাদের চিত্তবিক্ষোভ হয় অত্যন্ত বেশি। আরও একটি ব্যাপার এখানে আছে, মানুষ যখন তার মানবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে তখন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগবেই। নাট্যকার সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করার সুযোগটিও কাজে লাগাতে পারেন। অর্থাৎ যে মানুষের বিরুদ্ধে কিছু করা হল, যিনি ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন তিনি তো ট্র্যাজেডি লেখকের উপজীব্য চরিত্র হলেন বটেই, কিন্তু যে মানুষ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে নিজের বিবেক এবং শুভবোধ বিসর্জন দিয়ে বসল সেই ট্র্যাজেডি-নাট্যকারের কাছে কম আকর্ষণীয় চরিত্র নয়।

এই সূত্র ধরেই অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডির উপস্থাপনের বিষয় বা প্রধান উপজীব্য হল সেই সব মানুষের কাহিনী—'who have done or suffered something terrible'। লক্ষ করতে হবে, শুধু যাঁরা 'something terrible' সহ্য করেছেন কেবল তাঁরাই নন, যাঁরা সেই ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন তাঁরাও সমানভাবে ট্র্যাজেডির উপাদান। মানুষ তার অন্ধ প্রবৃত্তির বশে, নিজের কোনো অভীষ্ট বস্তু লাভ করবার জন্য, অথবা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যখন মানবিক অনুভূতির গলা টিপে মেরে একটা অন্যায় কাজ করতে তৎপর হয়ে ওঠে, তখন something terrible ঘটাবার জন্য সে হয়ে ওঠে নাট্যকারের প্রধান আকর্ষণের চরিত্র। তাকে নাট্যকার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন 'for doing something terrible'। আবার যখন কোনো মানুষ এই রকম কোনো চক্রান্তের শিকার হয় ; পরিবেশের সঙ্গে, অন্য মানুষের সঙ্গে, নিজের আদর্শের বা ভাবের

সঙ্গেও বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরাজিত হয়—অথচ বার বার আঘাত পেয়েও সে দমিত হয় না, ভেঙে পড়ে না, শেষ পর্যন্ত মানসিক সংগ্রাম চালিয়ে গিয়ে যখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাগুলিকে সে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, এবং শেষ পর্যন্ত বরণ করতে বাধ্য হয় শোচনীয় এক ভাগ্যবিপর্যয়, তখন তার এই মহৎ প্রতিরোধকে বলা যায় 'suffering something terrible'। কাজেই রোমহর্ষক কিছু কাজকর্ম বা অমানবিক ক্রিয়াকলাপ ঘটিয়ে তুলবার কারণেও যেমন ট্র্যাজিক চরিত্র হওয়া যায়, একের পর এক অমানবিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিহত করার মানসিক সামর্থ্যেও হওয়া যায় উপযুক্ত ট্র্যাজিক কারণ। দুজনকেই ট্র্যাজেডি রচয়িতা তাঁর নাটকের উপাদান বা আকর্ষণীয় অবলম্বন হিসাবে বেছে নিতে পারেন।

তবে আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাতেই এর বিষয়বস্তু হিসাবে অ্যারিস্টটলের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল—'action that is serious', অর্থাৎ বিষয়বস্তুটিতে যথেষ্ট গুরুগম্ভীর এবং ওজনদার হতে হবে, কোনো লঘু ঘটনা বা তরল চরিত্রকে ট্র্যাজেডির ঘটনা বা অবলম্বন হিসাবে বেছে নেওয়া চলবে না। সেরকম ভুল যদি কোনো নাট্যকার করেন তাহলে মহৎ নাট্যপ্রতিভা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হবে না। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের এই নির্দেশ মানা হয়নি এবং ট্র্যাজেডি হিসাবে সমর্থ নাট্যকারের রচনাও দুর্বল সৃষ্টি হিসাবেই পরিগণিত হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত আধুনিক কালে আমরা অনেক পেয়েছি।

৬.৪.১৬.৪ ট্র্যাজেডির উপাদান

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির উপাদান নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছেন এবং তাদের পারস্পরিক গুরুত্বের কথাও বলেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী কালে যেসব সমালোচনা হয়েছে, তার উল্লেখ করার আগে অ্যারিস্টটলের নির্দেশ এবং তাঁর যুক্তিগুলির পরিচয় আমরা গ্রহণ করব।

অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির উপাদান ছ'টি—কাহিনী বা বৃত্ত (Fable or Plot), চরিত্র (Character) , বাচন (Diction), মনন (Thought), দৃশ্যসজ্জা (Spectacle), এবং সংগীত (Music)। এগুলি বলতে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছেন এবং কাকে উপাদান হিসাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সে সব কথাও বলেছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করেই একে একে উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করছি। তারপর গুরুত্ব প্রশ্নটি বিচার্য।

প্রথম উপাদানটিকে Fable or Plot বললেও বৃত্ত বলতে অ্যারিস্টটল যে ট্র্যাজেডির কাহিনী অংশকেই বোঝেন, অথবা কাহিনীর কার্যকারণ শৃঙ্খল সমন্বিত বিন্যাস, এটি বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। কারণ তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'The Fable, in our present sense of the term is simply this, the combination of the incidents, or things done in the story ;' নাটকে ঘটনা বলতে বোঝায় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যা প্রদর্শিত হয়। সুতরাং কাহিনী হচ্ছে ক্রিয়াসমূহের দ্বারা প্রকাশিত তথ্যাবলী।

চরিত্র বলতে অ্যারিস্টটল বোঝেন নাটকের কাহিনীকে উপস্থাপন করবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নৈতিক গুণসম্পন্ন কিছু মানুষ। তাদের আচার-আচরণ এবং সংলাপের দ্বারা তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। তাঁর বক্তব্যের ইংরেজি অনুবাদ এইরকম—'Character is what makes us ascribe certain moral qualities to the agents.'

বাচন বলতে অ্যারিস্টটল খুব সাধারণ অর্থেই বোঝেন নাটকটি কীরকম ভাষায় লেখা হল। ছটি উপাদানের কোনটি বিষয় আর কোনটি অঙ্গসংক্রান্ত, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি যে কথা বলেছেন তাতেই এটা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন—'two of them arising from the means, one from the manner, and three from the objects of dramatic imitation.' অর্থাৎ 'বাচন' হল 'manner of dramatic imitation.' আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন এক জায়গায়—'by Diction I mean merely this, the composition of the verses ;'

মনন বা Thought বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বুঝিয়েছেন তা তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্পষ্ট হয়নি। মনন পদ্ধতি তো সমস্ত নাটকেই পরিব্যপ্ত থাকে—যেমন কাহিনী গ্রন্থনে, তেমনি চরিত্র সম্বন্ধে বোধে, আবার তার অঙ্গ সম্পদে বা বাচনেও। একে আলাদা করে ভাবার তেমন কিছু আছে কিনা বলা শক্ত। আবার আধুনিক ধারণা অনুসারে বলতে হবে, এটিই তো নাটকের সর্বস্ব। বিশেষত বার্নার্ড শ যেমন বলেছিলেন, নাটক মানে কেবল আলোচনা, আলোচনা এবং আলোচনা—তখন মননকেই তো আধিপত্য করতে দেওয়ার কথা তিনি বলেন। অ্যারিস্টটল আলাদা করে মনন বলতে কী বলতে চেয়েছেন এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, সমগ্র নাটক চরিত্র ও চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে যে সত্যে উপনীত হতে চায় তাই মনন।

নাটক যেহেতু দৃশ্যাত্মক শিল্প, সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য, দৃশ্যাত্মক ব্যাপারটিকে গুরুত্বহীন বলা চলে না। তবে শৈল্পিক উৎকর্ষের সঙ্গে এর যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, অ্যারিস্টটল সে কথাই বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন, দৃশ্যাসজ্জা ব্যাপারটা 'Connected least with the art of poetry..... the production of spectacular effects depends more on the art of stage machinist than on that of poet.' তাই যদি হয়, অর্থাৎ মঞ্চ নির্মাণ শিল্পীর ওপরই যদি বর্তায় দৃশ্যসম্পদ ব্যাপারটা, শৈল্পিক উৎকর্ষের সঙ্গে যদি তার বিশেষ যোগই না থাকে, তাহলে ট্রাজেডির দু'টি উপাদানের মধ্যে অ্যারিস্টটল তাকে ধরলেন কেন! তা যে ধরতে হবে, সেটাও তিনি বলেছেন, এর যত কম গুরুত্বই থাক না কেন—'the spectacle (or stage appearance of the actor) must be some part of the whole.

ষষ্ঠ উপদান সংগীত সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বিশেষ কোনো মন্তব্যই করেননি, কারণ তাঁর সময় নাটকে সংগীতের ব্যবহার ছিল প্রচুর। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ সংগীতই এক সময় নাটকে প্রায় একচ্ছত্র স্থান অধিকার করেছিল। সেই কারণেই অ্যারিস্টটল শুধু বলেছেন, 'by Melody what is too completely understood to require explanation'. আজ অবশ্য ট্র্যাজেডির সঙ্গে সংগীতের সেই অপরিহার্যতার সম্বন্ধ নেই।

নাটকের দু'টি উপাদানের মধ্যে অ্যারিস্টটল কোনটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবার সেই প্রসঙ্গ। অ্যারিস্টটল সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন কাহিনীর ওপর। এই নিয়ে পরবর্তীকালের নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা অনেক সমালোচনা করেছেন—কেউ তাঁকে সমর্থন করেছেন, কেউ সম্পূর্ণ ভিন্ন মতই পোষণ করেছেন, কিন্তু সে আলোচনার এখন দরকার নেই, আমরা অ্যারিস্টটলের মন্তব্যগুলিই জেনে রাখব।

অ্যারিস্টটল এ বিষয় যা বলেছেন সেটি আমরা এই অংশটির অনুবাদ করে, বাংলায় সাজিয়ে দিলাম :

'এই দু'টির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, কাহিনীর ঘটনাবলীর সংঘটন। ট্র্যাজেডি বলতে ব্যক্তির অনুকরণ বোঝায় না, বোঝায় ক্রিয়া এবং জীবনের অনুকরণ—সুখ এবং দুর্ভাগ্যের অনুসরণ। মানুষের যাবতীয় সুখ ও ভাগ্যবিপর্যয় ক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় এবং তার পরিণতি হচ্ছে একটা কার্যপদ্ধতি, কেবলমাত্র গুণ নয়। চরিত্র মানুষের অনেক গুণের আধার, একথা ঠিক, কিছু মানুষ কষ্টাদির মাধ্যমেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে—অর্থাৎ কিনা যেসব কাজ সে করে।'

অ্যারিস্টটলের যুক্তি বোঝা কষ্টকর নয়। ট্র্যাজেডিতে মানুষের জীবনের একটা, রূপ আমরা দেখতে চাই, সেই রূপ ঘটনার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। নাট্যকার যে ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করেন সেটা ঘটনা এবং কার্যের বিন্যাস সজ্জিত করেছে। এই বিন্যাসের ওপরই নির্ভর করে চরিত্রেরও গড়ে ওঠা। কাজেই আগে ঘটনার সজ্জার ওপর যত্নবান হতে হবে নাট্যকারকে, চরিত্রের গুরুত্ব তারপর।

চরিত্রসৃষ্টির চেয়ে, কাহিনী নির্মাণের গুরুত্ব যে অনেক বেশি, একথা বোঝবার জন্য অ্যারিস্টটল আরও কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন, যেমন—

এক ॥ খুব সূক্ষ্ম চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতা না থাকলেও ভালো ট্রাজেডি রচনা করা সম্ভব, কিন্তু বৃত্তের গঠন যদি দুর্বল হয় তাহলে মহৎ ট্রাজেডি গড়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

দুই ॥ এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে চরিত্রগুলি সুচারু রূপেই ফুটে উঠেছে—সংলাপও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সুরচিত, অথচ সমগ্র নাটকটি দেখে যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদন জেগে উঠল না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে ঘটনাসজ্জায় সঠিক দক্ষতা নাট্যকার দেখাতে পারেননি। যদি এর উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ ঘটনাসজ্জার সার্মথ্য নাট্যকারের আছে, কিন্তু চরিত্র নির্মাণের কৌশল তাঁর ঠিকমতো জানা নেই, এসব সংলাপ রচনা করার ব্যাপারেও একটু দুর্বলতা আছে—তাহলেও কিন্তু দেখা যাবে নাটক রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

তিন ॥ কমবয়সি নাট্যকাররা সংলাপ অত্যন্ত ভালো রচনা করতে পারে, চরিত্রচিত্রণের সামর্থ্যও তাদের কম নেই, কিছু নাটকের ঈপ্সিত রসাবেদন তারা জাগাতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে বৃত্তগঠনে তাদের ব্যর্থতা।

৬.৪.১৬.৫ . ট্র্যাজেডির নায়ক

ট্রাজেডির নায়ক চরিত্র ঠিক কেমন হবে, এ বিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ অনেক মন্তব্য করেছেন অ্যারিস্টটল। প্রায় সূত্রাকারে তিনি নায়কের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন। দীর্ঘদিন আগেকার এই নির্দেশ আজও সমানভাবে মানা হবে, অথবা নাট্যতত্ত্ববিদরা তার কোনো সমালোচনা করবেন না, এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতে যে আদর্শ ধরা পড়েছে তার ফলেও এ ধারণা কিছু পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা সেই সমালোচনার মধ্যে না গিয়ে সূত্রাকারে অ্যারিস্টটলের নির্দেশগুলি এখানে উপস্থিত করার চেষ্টা করব। পরে কিছু মন্তব্য করা যেতে পারে।

এক ।। মানুষকে পরিস্ফুট করার তিনটি উপায় কবিদের কাছে আছে—সে যেমন তাকে তার চেয়ে উন্নত রূপে দেখানো, সে যেমন ঠিক সেইভাবেই তাকে দেখানো এবং সে যেমন তার চেয়ে হীনভাবে তাকে দেখানো। ট্রাজেডিতে আমরা দেখাই প্রথম উপায়ে অর্থাৎ সে যেমন তার চেয়ে উন্নত রূপে, কারণ জীবনের গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপস্থাপনে এই রূপায়ণই কাম্য।

দুই ।। ট্র্যাজেডির নায়ক হবেন বিখ্যাত মানুষ এবং উন্নতিকামী। কীরকম সেটা অ্যারিস্টটল দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে জানিয়েছেন—'He must be one who is highly renowned and prosperous–a personage like Oedipus, Thyestes or other illustrious men of such familis.'

তিন ।। ট্র্যাজেডির নায়ক হবে প্রকৃতই সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ।

চার ।। শুধু উন্নতভাবে চিত্রিত করা নয়, ট্র্যাজেডির নায়কদের বস্তুতই হতে হবে উচ্চশ্রেণীর মানুষ। কমেডিতে যেমন সাধারণ অপেক্ষা নীচু স্তরের মানুষ বা lower type-কে বাছা হয়, ট্র্যাজেডিতে বেছে নেওয়া হয় সাধারণের চেয়ে উচ্চ স্তরের মানুষ বা higher type-এর মানুষকে।

পাঁচ ।। অত্যন্ত ভালো মানুষ (too good a man) অথবা প্রকৃতই কোনো ধার্মিক ব্যক্তি (virtuous man) ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কারণ ঐরকম মানুষ্যের ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের মনে ঠিক ট্র্যাজিক সংবেদন আনেনা—আমাদের এইরকম ঘটনা অত্যন্ত আহত করে (shocks us)। এই বেদনার অনুভূতি ট্র্যাজেডির pity and fear-এর অনুভূতি থেকে পৃথক।

ছয় ।। অত্যন্ত মন্দ লোক (too bad a man) বা অত্যন্ত শয়তান একটা ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারে না। ট্র্যাজিক সংবেদনের মূল কথাটাই হল তাকে হতে হবে এমন একজনের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় যার পক্ষে সেটা আদৌ প্রাপ্য বলে আমরা মনে করতে পারি না। অত্যন্ত খারাপ

লোকের যদি শোচনীয় পরিণাম দেখানো হয়, আমাদের মনে হবে সেটাই তো তার প্রাপ্য, কাজেই ট্র্যাজেডির সংবেদন কখনই জাগাবে না।

সাত ।। ট্র্যাজেডির নায়ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন অ্যারিস্টটল যেটা শুধু ব্যাখ্যার যোগ্য যে, তাই নয়, গ্রিক ট্র্যাজেডি থেকে শুরু করে শেক্সপীরিয় ট্র্যাজেডি—এবং বলতে পারি আমাদের দিনের ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। [বাইওয়াটারের ইংরেজি অনুবাদটা আগে বলি—"He falls from a positon of the lofty eminence and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to a great error] তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডির বিশিষ্ট সংবেদন আমরা লাভ করতে পারি কেবল আমাদের মতো মানুষের ভাগ্যবিপর্যয় দেখলেই। অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়ক হবেন না-অতি ভালো না-অতি মন্দ, আমাদের মতোই মানুষ। তাঁর পতন বাইরে থেকে কেউ ঘটাবে না, কোনো 'vice or depravity'-র জন্য তাঁর সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে না, পতনের কারণ থাকবে তাঁরই চরিত্রের মধ্যে। কিসের কারণে তাঁর পতন ঘটতে পারে, এই কথাদুটিই খুব গুরুত্বপূর্ণ—হয় কোনো বিচার-বিভ্রমের (error of judgement) ফলে, অথবা অন্তর্নিহিত কোনও ত্রুটির (frailty) ফলে।

বিচার-বিভ্রম মানুষের ঘটতেই পারে এবং একটি সামান্য ভুল সিদ্ধান্ত তার জীবন শোচনীয় করে তুলতে পারে। এ ঘটনা বহু আগেও যেমন ঘটেছে, আজকেও সে রকম ঘটতে পারে। অ্যারিস্টটল ঐতিহাসিক নাটক থেকে বা বিখ্যাত গ্রিক চরিত্র থেকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আজকের দিনে ভুল সিদ্ধান্ত মানুষকে কোন 'lofly eminence' থেকে কোন 'disaster-এ নামিয়ে আনতে পারে, তার অনেক ভালো উদারহণ পাওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় কথাটি হল frailty বা অন্তর্নিহিত ত্রুটি। এই ত্রুটিকে অনেক সময়ই ত্রুটি বলে মনে না হতে পারে। কিন্তু একটা কথা আছে too much of everything is bad। অনেক সময় অতিরিক্ত ভ্রাতৃপ্রীতি, অতিরিক্ত উচ্চাশা বা মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মানুষের পতন ডেকে নিয়ে আসতে পারে। ভ্রাতৃপ্রীতির এই প্রাবল্য যেমন জীবনে সর্বনাশ নিয়ে এসেছিল অ্যান্টিগোনের ('প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশেরও তাই হয়েছিল), উচ্চাশার প্রাবল্য শেষ করে দিয়েছিল ম্যাকবেথের মতো বীরকে, নির্বোধ আত্মবিশ্বাস পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্রাট জুলিয়াস সিজারের।

ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল যে মন্তব্যগুলি করেছেন তার শেষেরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সে আলোচনাই আমরা আগে করলাম। অন্যান্য মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে বলা যায়, ট্রাজেডির নায়ককে বিখ্যাত উন্নতিকামী হতে হবে বলে যে মন্তব্য তিনি করেছেন, সেটা করেছেন ঐতিহাসিক ট্রাজেডির কথা স্মরণ রেখেই। অন্যান্য শ্রেণীর নাটকের কথা চিন্তা করলে এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। নায়ক অতি ভালো হবেন কিনা, অতি মন্দ হলে চলবে না কিনা, এসব কথার উদ্দেশ্য আসলে এই কথা বলা যে, দোষেগুণে

তাঁকে হতে হবে রক্তমাংসের মানুষ—তা না হলে তাঁর পতনে আমরা করুণাও অনুভব করব না, তাঁর পরিণতি আমাদের মনে ভয়ও জাগাবে না।

ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনা অ্যারিস্টটল অন্যত্র যা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে আমরা ট্র্যাজেডির বিষয়ে একটি কথা সংযোজন করতে চাই। ট্র্যাজেডি যদি দু ভাবে হয়—spectacle of *doing* something terrible এবং spectacle of *suffering* something terrible, তাহলে নায়কও দুরকমই হতে পারে, এক, দুর্দান্ত কিছু করে এবং দুর্দান্ত কিছু সহ্য করে। অ্যারিস্টটল অন্যত্র দুরকম নায়কের কথা স্বীকার করেছেন—প্রথম প্রকারের নায়ককে বলেছেন active hero এবং দ্বিতীয় প্রকারের নায়ক acted upon (বা passive) hero. Passive নায়কের ক্ষেত্রেও একটা কথা মনে রাখতে হবে, দুর্দম মানসিক বা শারীরিক আঘাত সহ্য করার শক্তি সে নায়কের থাকতে হবে, কারণ সহ্য করার মহত্ত্বেই তিনি নায়কের সম্মান পেতে পারেন। মানসিকভাবে যিনি পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন, আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাই যাঁর নেই, তিনি এ জাতীয় নায়ক হতে পারেন না।

৬.৪.১৬.৬ : ট্র্যাজেডির মূল রস

ট্র্যাজেডির মূল রস সংবেদন কী, এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি, তিনি স্পষ্টতই pity এবং fear এই দুটি অনুভূতির কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা মনে করেন মূল রস সংবেদন একটিই হতে পারে, দুটি নয়। সুতরাং আগে সন্ধান করা যাক কাজ দুটি কখন কীরকম তাৎপর্যে তিনি ব্যবহার করেছেন, তারপর এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা আমরা করব।

(ক) ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে দুটি সংবেদনকেই অ্যারিস্টটল ঠিক একই রকম গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, নাট্যকারের লক্ষ্য—'incidents arousing pity and fear'.

(খ) ট্র্যাজেডির স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বৃত্ত বলতে কী বোঝেন, অ্যারিস্টটল সে কথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে pity এবং fear-এর কথা একবার বলেছেন। কিন্তু লক্ষ করে দেখলে বোঝা যাবে, সেখানে তিনি দুটি সংবেদনকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন একই ভাবে, কিন্তু ট্র্যাজিক সংবেদন হিসাবে দুটিই প্রয়োজন এমন কথা বলেননি। সেখানে তাঁর বক্তব্য, হয় pity অথবা fear, দুটির মধ্যে একটি সংবেদন ট্র্যাজিক আবেদনের পক্ষে প্রয়োজন—'Tragedy is an imitation not only of a complete action, but of events inspiring fear or pity.'

(গ) পরিস্থিতি বিপর্যয় (peripety) প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জটিল বৃত্তের গঠনে তার কী ভূমিকা, এ বিষয়ে আলোচনায় অ্যারিস্টটল যেভাবে গোটা ব্যাপারটাকে উপস্থিত করেছেন তাতে স্পষ্ট

করে না বললেও ইঙ্গিত এমনই আছে যে দুটি সংবেদনের একটি থাকলেই বোধ হয় ট্র্যাজিক অনুভূতি জাগে—'This with a Peripety, will arouse EITHER pity or fear—actions of that nature being what Tragedy is assumed to represent.'

(ঘ) ট্র্যাজেডির নিখুঁত গঠন বিষয়ে আলোচনার সময় অবশ্য শব্দদুটিকে একই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অ্যারিস্টটল এবং তাঁর মন্তব্যের গতি থেকে বোঝা যায় দুটি সংবেদন একসঙ্গে সৃষ্টি করাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তিনি লিখেছেন—'it should, moreover, imitate actions which excite pity and fear, this being the distintive mark of tragic imitation'.

এবার আমাদের ধারণা আমরা নিবেদন করতে পারি। প্রথম কথা হল, fear বা ভয়ের অনুভূতি যে ট্র্যাজেডি দেখলেই আমাদের মনে জাগে, এ কথা অ্যারিস্টটল বারবারই বলেছেন। মানসিক উৎকণ্ঠা বা আতঙ্ক থেকেই এই হবেই সৃষ্টি হয়, কারণ এরকম একটু মানুষের জীবনেও এমন পরিণতি নেমে আসছে দেখলে ভয় আমাদের করেই। কিন্তু সম্পূর্ণ মনের ভেতর থেকে যদি ভয় না জাগে, বাইরে ভয়ংকর দৃশ্যসজ্জার দ্বারা যদি নাট্যকার দর্শককে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন তাহলে তা যে মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, এ কথা তিনি লিখেছেন এইভাবে—'those who employ spectacular means to create a sense not of the terrible, but only monstrous, are strongers to the purpose of tragedy'। কাজেই বোঝা যায়, fear সম্বন্ধে সামান্য হলেও কিছু কম গুরুত্বের ব্যাপারটা অ্যারিস্টটলের মনে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কথা, করুণা সম্বন্ধে এরকম কোনো সাবধানবাণী তিনি শোনাবার প্রয়োজন মনে করেননি। শুধুমাত্র 'ভয়' এই সংবেদন দিয়ে কোনো মহৎ ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। Horror stories-এর মতো Horror plays—হয়তো থাকতেও পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির যে চারটি বিভাগ করেছিলেন সেখানে ভীতিপ্রধান ট্র্যাজেডি বলে কোনো বিভাগ তিনি করেননি। জটিল প্লটের perfect tragedy-তে বরং এই দুই সংবেদনের সঙ্গে আর একটি সংবেদনের মিশ্রণের কথা তিনি বলেছেন—বিস্ময়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে যে-কোনো মহৎ ট্র্যাজেডিতেই এই বিস্ময়ের মিশ্রণ থাকে—'The element of the wonderful is required in Tragady'। কাজেই শুধু pity এবং fear কেন, তার সঙ্গে wonderful-ও ট্র্যাজেডি মাত্রেই থাকতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই তিনটিকেই আমরা বলতে পারি মনোভাব বা চিত্তবৃত্তি। সংস্কৃত আলংকারিরা যাদের 'রস' বলেন, এরা তা নয়। আমাদের মনে হয় এদের সম্মিলিত কাজ হল, মূল রসাবেদন জাগিয়ে তোলা এবং সেই অঙ্গীরসটি হল করুণ বা করুণা। অর্থাৎ মূল রসের সংবেদন সৃষ্টিকারী ভাব ট্র্যাজেডিতে অনেক থাকলেও অ্যারিস্টটলের আলোচনার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করলে সম্ভবত এ বিষয়ে একমত হওয়া যাবে যে, তার মূল রসনিষ্পত্তি হচ্ছে করুণ রস।

৬.৪.১৬.৬ : ক্যাথারসিস বা চিত্তশুদ্ধি

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'ক্যাথারসিস' শব্দটি অ্যারিস্টটল ব্যবহার করেছিলেন। গোটা সংজ্ঞা এখানে উদ্ধার করার দরকার নেই, তার শেষ অংশটি ছিল এইরকম '....incidents arousing pity and fear, where with to accomplish its Catharsis of such emotions' শেষে 'emotions' শব্দটি আছে বলেই বাংলায় একে আমরা করেছি চিত্তশুদ্ধি বা পরিশুদ্ধি। অ্যারিস্টটল তাঁর এই সংজ্ঞার প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ নিয়েই আলোচনা করেছেন, কিন্তু 'ক্যাথারসিস' শব্দটি দিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি, ফলে এ নিয়ে নাট্যতত্ত্ববিদরা অনেক জল্পনা-কল্পনা ও বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। এখনো পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, এমন কথা বলব না, তবে বিভিন্ন যে ব্যাখ্যাগুলি আমরা পেয়েছি, সেগুলি আমরা জেনে রাখতে পারি। তারপর নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করব।

একেবারে প্রাথমিকভাবে দেখতে গেলে, এটি চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষা, যার নিজস্ব অর্থ হচ্ছে purgation বা বিমোক্ষণ। অ্যারিস্টটলের পিতা ছিলেন চিকিৎসক, শব্দটিও সাধারণের কাছে অপরিচিত ছিল না। সেইজন্যেই কথাটি সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে এটি বিশেষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন বোধ করেননি অ্যারিস্টটল, এমন অভিমত কেউ কেউ পোষণ করেন। তাঁদের মতে, রূপকার্থে এটাই অ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন যে, জীবনের ভীতিপ্রদ ও করুণাদায়ক ঘটনার অনুকরণ করে ট্র্যাজেডি দর্শকদের দেখায় উদ্দেশ্য একটাই—রেচক ওষুধ যেমন আমাদের শরীরের বর্জ্য পদার্থ বার করে দেয়, এই নাট্যাভিনয়ও আমাদের মনের কু-প্রকৃতির শোষণ ঘটিয়ে একভাবে আমাদের মানসিক পরিশোধন করে। এর ফলে ভয় ও করুণার প্রাবল্য থেকে আমাদের মন মুক্ত হয় এবং আমরা সাহসী হয়ে উঠি।

এই ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি বা আমরা গ্রহণ করতে পারি, দ্বিতীয়াংশটি একেবারেই পারি না। এমন হতেই পারে যে শব্দটি অ্যারিস্টটলের অতি পরিচিত বলে চিকিৎসাশাস্ত্রের সেই শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মনের বৃত্তিকে নিষ্কশিত করার জন্য আমাদের ট্র্যাজেডি দেখতে হবে, এ কথা সমর্থনযোগ্য নয়। চিত্তবৃত্তি যদি নিষ্কাশিতই হয়ে গেল, তবে কোন অনুভূতির সাহায্যে আমরা নাটক দেখব! চোখের সামনে একটি উচ্চাশা বা উচ্চভাবের পতন দেখলে আমরা ভয় পাই বা আমাদের সহানুভূতি জাগে এ কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে ভয় ও সহানুভূতির মনোভাবই আমাদের মন থেকে চলে যায়, এ কথা বলা বোধ হয় ঠিক নয়। বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে এই বৃত্তিগুলির এমন কোনো অহিনকুল সম্পর্কও নেই যে এদের মন থেকে তাড়াতে না পারলেই মানুষ ভীরু হয়ে যাবে।

লুকাস প্রমুখ সমালোচক 'ক্যাথারসিস' শব্দটির একটি অন্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। প্রথমেই চিকিৎসাক্ষেত্রের অনুষঙ্গ থেকে শব্দটিকে তাঁরা তাড়াতে চেয়েছেন, বলেছেন শব্দটির তাৎপর্য যদি কিছু বার করতেই হয় তবে শৈল্পিক প্রক্রিয়াতেই তা করতে হবে, চিকিৎসার সঙ্গে একে সম্পর্কিত করে কোনো লাভ নেই। ট্র্যাজেডিকে মানুষের হাসপাতালে পরিণত করার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়, এমনকী যদি তাকে মনের

হাসপাতাল বলতে চাওয়া হয়, তাও নয়। এঁদের মতে, নাটকে প্রদর্শিত কাহিনীর দ্বারা সৃষ্ট ভয় এবং করুণা নামক দুটি ভাব যে শিল্পিত প্রক্রিয়ায় আনন্দে পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াকেই অ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন ক্যাথারসিস।

এই ব্যাখ্যা এবং ট্র্যাজেডি কেন আমাদের আনন্দ দেয়—এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় সমার্থক। কিন্তু অ্যারিস্টটল ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন কিনা বোঝার বিশেষ কোনো উপায় নেই। কারণ ভয় ও করুণার সংবেদন মানুষকে কেন আনন্দ দেয়, এ বিষয়ে তিনিও কয়েকবার আলোচনা করেছেন, কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার কোথাও 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেননি। ট্র্যাজেডির আনন্দ যে 'ক্যাথারসিস'- জনিত আনন্দ, এমন কথা না বলে তিনি বলেছেন, এই আনন্দ—'comes from pity and fear through imitation'। অর্থাৎ অনুকরণের শিল্পরূপই যে আনন্দ সৃষ্টির কারণ, এ কথাই বিভিন্নভাবে তিনি বলতে চেয়েছেন।

'ক্যাথারসিস' শব্দটির তৃতীয় আর একটি ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভীতি এবং করুণা এই দুটি মনোভাব হল পরস্পর বিরোধী বা বিপ্রতীপ। এই বিপ্রতীপ দুটি ভাবাবেগের দ্বন্দ্ব আমাদের মনে ক্রিয়াশীল হয় ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখে এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি মানসিক ভারসাম্যে উপনীত হয় অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রশমনের ফলে মন শান্ত হয়, তখন সেই প্রশান্তির আনন্দকেই বলা হয়েছে 'ক্যাথারসিস'।

এটি একটি নতুন ব্যাখ্যা কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অ্যারিস্টটলের আলোচনায় এর কোনোরকম ইঙ্গিত আছে বলে আমাদের মনে হয় না। পোয়েটিক্সের আলোচনা থেকে এ কথা একবারও মনে হয় না যে অ্যারিস্টটল ভীতি ও করুণাকে দুটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ট্র্যাজেডি নাটক দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমাদের এ কথা বলে না যে ভয় এবং সহানুভূতির মনোভাব প্রশমিত হয়ে গেলে, অর্থাৎ মন থেকে চলে গেলেই প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায়। বরং উল্টোটাই যেন হয়—এদের তীব্রতা যত বাড়ে, অভিনয় দেখার আনন্দও বাড়ে তত।

তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল! লুকাস প্রভৃতি সমালোচকেরা যেখান থেকে ব্যাখ্যা শুরু করেছেন, সেটা আমরা মেনে নিতে পারি, 'ক্যাথারসিস' কথাটাকে শৈল্পিক প্রক্রিয়া হিসাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে, চিকিৎসাশাস্ত্রের কাজ হিসাবে নয়। এর পর অ্যারিস্টটলের ব্যবহৃত বাক্যগুলি থেকে যদি ব্যাখ্যার কোনো ইঙ্গিত সন্ধান করতে হয় তবে বলতে হবে সেটা এই বাক্যের মধ্যেই আছে, যেখানে তিনি বলেছেন—'he , who hears the tale told will thrill with horror and melt to pity.' অর্থাৎ নাট্যকার এমনভাবেই তাঁর সৃষ্টি উপস্থাপিত করবেন, যাতে দর্শকদের মনে ভয় ও করুণা পৌঁছবে চরম মাত্রায়। এই চরম মাত্রায় পৌঁছনোকেই বোধহয় বলে 'purgation of such emotions'। একেই বোধহয় রসনিষ্পত্তি বলে আমরা ধরে নিতে পারি এবং তা যদি হয় তবে 'ক্যাথারসিস' বলতে অ্যারিস্টটল একেই বোঝাতে চেয়েছেন।

৬.৪.১৬.৮ মহাকাব্য : ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার তুলনা

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে মহাকাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এর পর বিস্তৃত আকারে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না থাকলেও পরে কোনো কোনো অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির সঙ্গে তার তুলনা প্রসঙ্গে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। আমরা মহাকাব্য সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণার পরিচয় পাই, ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনায় তিনি যা বলেছেন, এবং শিল্প হিসাবে উভয়ের তুলনামূলক গুরুত্ব বিষয়ে তাঁর যা ধারণা, সেগুলি সূত্রাকারে এভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি :

এক ।। মহাকাব্যের লক্ষ্যও ট্র্যাজেডির মতো গুরুগম্ভীর ঘটনার অনুকরণ এবং মহাকাব্যও উচ্চশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করে থাকে।

দুই ।। ট্র্যাজেডিকে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতো 'দৃশ্যকাব্য' না বললেও একে দৃশ্যাত্মক কাব্য (Narrative of spectacles) অ্যারিস্টটল বলেছেন। তার সঙ্গে তুলনায় মহাকাব্যকে বলেছেন শ্রবণমূলক কাব্য (Narrative in form)।

তিন ।। মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির বৃত্ত গঠনের রীতি একরকম হওয়া উচিত বলেই অ্যারিস্টটল বিভিন্ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন।

চার ।। ঘটনাগত ঐক্য বা unity of action ট্র্যাজেডির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অ্যারিস্টটল মনে করেন এই ঐক্য মহাকাব্যের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত দরকার। তা ছাড়াও মহাকাব্যে যা দরকার বলে তিনি মনে করেন তা একেবারে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়—'It should have for its subject a single action, whole and complete with a beginning, a middle and end. It will thus resemble a living organism in all its unity.'

পাঁচ ।। অ্যারিস্টটল মনে করেন ট্র্যাজেডির যতগুলি প্রকারভেদ হতে পারে, মহাকাব্যের শ্রেণীভেদও ততগুলিই হতে পারে। ট্র্যাজেডির মতোই মহাকাব্যের শ্রেণীভেদ করেছেন তিনি চারটি—জটিল, নীতিমূলক, সরল এবং করুণ রসাত্মক। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেছেন, গঠনের দিক থেকে 'ইলিয়াড' মহাকাব্য সরল, 'ওডিসি'-র গঠন একটু জটিল ; কিন্তু রসের বিচারে আবার ইলিয়াড করুণ রসাত্মক, ওডিসি-কে বলা যায় নীতিমূলক মহাকাব্য।

ছয় ।। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের প্রধান পার্থক্য আয়তনে। আয়তন বলতে অ্যারিস্টটল দুটি জিনিস বুঝিয়েছেন—বিশালতা (in the scale on which it is constructed) এবং দৈর্ঘ্য (length)। দু- দিক থেকেই মহাকাব্য অনেক বড়ো। অবশ্য মহাকাব্যে আয়তন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বলেই তা বাড়তে পারে, নাটকে একই সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপাখ্যানের একত্র সমাবেশও মহাকাব্যে ঘটানো সম্ভব যার ফলে

মহাকাব্যের সৃষ্টিতে বিশালতা ও গাম্ভীর্য আনা সম্ভব। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অভিমত—'This then is a gain to the Epic, tending to give it grandeur, and also variety of interest and room for episodes of diverse kinds.'

সাত ।। ছন্দের বিচারে বলা যায়, হিরোইক ছন্দই মহাকাব্যের উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাব্য বলেই শুধু নয়, অ্যারিস্টটলের অভিমত হল এই যে, হিরোইক ছাড়া অন্য যে কোনো ছন্দে বর্ণনাত্মক কাব্য রচনা করতে গেলে তা কাব্যের রসগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করবে। কারণ হিরোইক ছন্দই সবচেয়ে স্থাপত্যধর্মী এবং রাজকীয়। অন্য দিকে মোটামুটি জীবনের চলমান দিকটি দেখাবার উপযুক্ত ছন্দ হল আয়াম্বিক আর ট্রোকাইক—দ্বিতীয়টি আবার নৃত্যের ছন্দ ফুটিয়ে তুলবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

আট ।। মহাকাব্যের এত প্রশস্তি সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল কিন্তু মনে করেন, ট্র্যাজেডি মহাকাব্য অপেক্ষা আরও উচ্চস্তরের সৃষ্টি। তার্কিকের মতো তিনি মহাকাব্যের স্বপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেছেন ও ট্র্যাজেডির মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ট্র্যাজেডির বিপক্ষে বড়ো যুক্তি হল অভিনয়ের সাহায্য না পেলে তার রস পরিস্ফুট হয় না। বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গির সাহায্য না পেলে যা মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাকে কেমন করে উচ্চশ্রেণীর শিল্প বলা যায় ! অ্যারিস্টটল এর উত্তরে বলেছেন, অঙ্গভঙ্গি মহাকাব্য পাঠেও যে হয় না এমন নয়। তাছাড়া মহৎ ট্র্যাজেডি অভিনয় ছাড়া শুধু পাঠেই পাঠককে তৃপ্ত করতে পারে। তিনি আরও দেখিয়েছেন, মহাকাব্যের উপাদান চারটি, কিন্তু ট্র্যাজেডির উপাদান ছটি। মহাকাব্যের ছন্দেও নাটক লেখা যায়। আরও সংহত সৃষ্টি বলে নাটকের রসাবেদন আরও তীব্র। সুতরাং তাঁর অভিমত, 'Tragedy is the higher art'।

৬.৪.১৬.৯: ইতিহাস ও কাব্যের তুলনা

অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের নবম অধ্যায়ে ইতিহাস এবং কাব্যের মধ্যে তুলনায় কিছু বাক্য ব্যয় করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, mimesis ব্যাপারটা যে নিছক নকল বা অন্ধ অনুকরণ নয়, সেটা বুঝিয়ে দেওয়া। সেই প্রসঙ্গেই তিনি ইতিহাসের তুলনায় কাব্যকে অনেক উন্নত এবং তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি বলে মনে করেছেন। পরে যখন তিনি সম্ভাব্যতা (probability) এবং ঘটমানতা (possibilities) কথা দুটিকে ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তখন মূলত তাঁর নবম অধ্যায়ের আলোচনার তাৎপর্য এসে দাঁড়িয়েছে ঐতিহাসিক কাব্যের (বা নাটক, এবং আধুনিক কালে অবশ্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস) সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক বোঝায় এবং ইতিহাসের চেয়ে ইতিহাস নির্ভর শিল্পের উৎকর্ষ কেন বেশি।

মহৎ কবি যখন কিছু অনুকরণ করেন তখন সেটির অন্ধ অনুকরণ তিনি করেন না, তাঁর মনে আরও দুটি ব্যাপার সেই সঙ্গে সক্রিয় থাকে—বস্তুটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা ভাবা হয়, এবং বস্তুটির যেমন হওয়া উচিত। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়—চরিত্রটি ঠিক কীরকম, তার সঙ্গে যোগ দেয় তার কীরকম হওয়া উচিত ; অথবা তাঁর অধিকার, যাকে শ্রেয় ভাবে চিত্রিত করার, বা হেয় ভাবে তুলে দেখাবার।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের এখানেই প্রধান তফাত। অনেকে মনে করেন তফাতটা মাধ্যমের—একটি গদ্যমাধ্যমে লেখা, অন্যটি পদ্যমাধ্যমে, সেটিও কিন্তু কোনো প্রকৃত তফাতই নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন, ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা গদ্যে লেখা না হয়ে যদি পদ্যে লেখা হতো, ছন্দ থাকা সত্ত্বেও সেটা ইতিহাস হয়েই থাকত, কাব্য তাকে কেউ বলত না।

কাব্যকে যে ইতিহাসের চেয়ে অ্যারিস্টটল মহত্তর শিল্প বলতে চান তার প্রথম কারণ, সঠিক ভাবে যা-যা হয়েছে, ইতিহাস তারই একটা নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে, পক্ষান্তরে কাব্য কিন্তু যা ঘটতে পারে এবং যা ঘটা উচিত বলে মনে হয়, সেটারও বর্ণনা দিতে পারে। যেসব ঘটনা সত্যিই ঘটেছে যাকে ইংরেজিতে বলে possible ঘটনা বা incidents, সেগুলোকেও অনেক সময় অসম্ভব বলে মনে হয়, কারণ তার মধ্যে যুক্তিসিদ্ধতা বা probability হয়তো থাকে না ; পক্ষান্তরে এমন অনেক ব্যাপার থাকতে পারে বা হয়তো আদপে কখনোই ঘটেনি অর্থাৎ অঘটন (impossibility), কিন্তু যুক্তি দিয়ে দেখলে মনে হয় ঘটতেই তো পারে, অর্থাৎ সম্ভাব্য (probable)। অ্যারিস্টটল মনে করেন কাব্যে অসম্ভাব্য ঘটনার চেয়ে সম্ভাব্য অঘটনও বরং অনেক বেশি কাম্য। তাই ইতিহাসের চেয়ে কাব্য অনেক বেশি দার্শনিক মূল্য সম্পন্ন (more philosophic)।

দ্বিতীয় কথা, কাব্য ইতিহাসের চেয়ে মহত্তর শিল্প এই কারণেই যে, কাব্য প্রকাশ করতে চায় একটি শাশ্বত বা সামান্য সত্য (universal)-কে, কিন্তু ইতিহাস প্রকাশ করে এক বিশেষ সত্যকে (particular)। বিশেষ সত্য বলতে বোঝায় একটি বিশেষ লোক একটি সময়ে ও বিশেষ পরিস্থিতিকে ঠিক কীরকম ব্যবহার করেছে। সাধারণ সত্য তাকেই বলে যেখানে একটি বিশেষ লোক বিশেষ পরিস্থিতি আবশ্যিক ও সম্ভাব্যের নিয়ম মেনে ঠিক কীরকম প্রতিক্রিয়া করে থাকে। ইতিহাস একটি শ্রেণীগত সত্যের পরিবর্তে একটি মানুষের জীবনের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণই ফুটে ওঠে। কবিও সেই একই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সময়ের কিছু পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের আচার-আচরণ দেখান। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে, সেই ব্যক্তিগত জীবনচিত্র থেকে একটি সার্বজনীন চিত্র পাঠককে উপহার দেবার।

এবারে আমরা এসে উপস্থিত হতে পারি সেই প্রসঙ্গে, যখন শুধু কাব্য নয়, আমরা ঐতিহাসিক কাব্যের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি ইতিহাসের। যেখানে ইতিহাসের একটি অধ্যায়ই কবি তাঁর কাব্যবিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে তাঁকে আমরা কী বলব, কবি না ঐতিহাসিক ! অ্যারিস্টটলের অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা যখন কবির আছে তখন প্রকৃতই যা ঘটেছে (অর্থাৎ ইতিহাসে যার বিবরণ থাকে)

কবি তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ঘটে যাওয়া সেই অতীত ঘটনার যথাযথ বিবরণে তাঁকে নিবদ্ধ থাকলেই চলবে না, সেই ঘটনা অনিবার্য এবং বাস্তবতার গুণে সম্ভাব্য হয়ে উঠেছে কিনা, তাও তাঁকে বিচার করতে হবে। সব ঘটনার সম্ভাব্যতার গুণ থাকে না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কবি যদি নির্বিচারে ইতিহাসের ঘটনামাত্রই গ্রহণ করে যান তবে তা ইতিহাস হয়েই থাকবে, কাব্যের মর্যাদা পাবে না। ইতিহাসের চেয়ে কাব্য মহত্তর সামগ্রী, কাজেই ইতিহাস যদি তিনি অনুসরণও করেন, নিজের বিচারবুদ্ধি, সম্ভাব্যতার বিধি এবং ঔচিত্যবোধ দিয়ে সেই বিশেষ ঘটনাকে তাঁকে সাধারণ সত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

৬.৪.১৬.১১০: সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব : সাধনকুমার ভট্টাচার্য

২। কাব্যতত্ত্ব : অ্যারিস্টটল (অনুবাদ) : শিশিরকুমার দাশ

৩। নন্দনতত্ত্ব : সুধীরকুমার নন্দী

৪। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ : ভবানীগোপাল স্যান্যাল

৫। সাহিত্য-বীক্ষণ : হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৬। নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা : তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)

৬.৪.১৬.১১ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ অবলম্বন করে তাঁর অনুকরণ-তত্ত্বের স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

২। কমেডিকে অ্যারিস্টটল কেন উচ্চশ্রেণীর শিল্প বলতে চাননি বল।

৩। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির কী সংজ্ঞা দিয়েছেন লেখো এবং সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে এর যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও।

৪। ট্র্যাজেডির প্রধান শ্রেণী কটি বলে অ্যারিস্টটল মনে করতেন ? প্রত্যেকটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

৫। ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বিষয়বস্তু কী হতে পারে বলে অ্যারিস্টটল মনে করতেন, সে বিষয়ে আলোচনা করো।

৬। ট্র্যাজেডির উপাদান মোট কটি ? অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্সের কোন অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন ? কোন উপাদানকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, তুলনামূলক আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৭। ট্র্যাজেডির নায়ক হবার যোগ্যতা কী ধরনের চরিত্রের আছে, এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করো।

৮। 'ক্যাথারসিস' বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কী বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে ভিন্ন ধরনের কয়েকটি মতের পরিচয় দিয়ে তোমার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করো।

৯। মহাকাব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের যে অভিমত তাঁর পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও।

১০। ইতিহাস এবং কাব্যের মধ্যে কোনটিকে অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠতর মনে করেন এবং কেন, যুক্তি সহকারে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।